প্রধান সম্পাদক

ড. মোঃ শরীফ উদ্দিন

প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, চট্টগ্রাম

সহযোগী সম্পাদক

আইরিন আসাদ, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

রচনায়

অধীর চন্দ্র দাস, উপ প্রকল্প পরিচালক

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, সহকারী পরিচালক

বিক্রম জীৎ রায়, সহকারী পরিচালক

নৃপেন্দ্র কুমার সিংহ, সহকারী পরিচালক

আল মামুন, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

মোঃ ফারহান তাজিম, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

গাজিউর রহমান, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

সঞ্জয় কুমার মোহন্ত, মেরিন ফিসারিজ অফিসার

এ্যানি কর্মকার, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

সহযোগিতায়

অপু বৈদ্য, হিসাব রক্ষক

মোঃ সামছুল আলম, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

প্রকাশনায় প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

প্রকাশকাল জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

মুদ্রণ

.... প্রকাশনী

মহাপরিচালক

মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য সেক্টরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অনস্বীকার্য। বর্তমান সরকারের সুচিন্তিত নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও মৎস্যবান্ধব কার্যক্রম গ্রহণের ফলে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশে মোট ৪৩.৮৪ লক্ষ মে.টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে। তন্মধ্যে ৬.৫৯৯ লক্ষ মে. টন সামুদ্রিক মৎস্য সেক্টরের অবদান যা মোট মৎস্য উৎপাদনের শতকরা ১৫.০৫ ভাগ। সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে সরাসরি নিয়োজিত জেলের সংখ্যা প্রায় ৫.১৬ লক্ষ। এছাড়া উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় ১০ লক্ষাধিক লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে এ সেক্টরের সাথে জড়িত রয়েছে।

বৈচিত্রময় জলজ সম্পদে ভরপুর বাংলাদেশের দক্ষিণে বিস্তৃত রয়েছে ফানেল আকৃতির বঙ্গোপসাগর। সমুদ্রসীমানা নিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের সাথে শান্তিপূর্ণ বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে ১,১৮,৮১৩ বর্গ কি.মি. জলাশয়ে দেশের সার্বভৌম একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সমুদ্রভিত্তিক অর্থনৈতিক (Blue Economy) সমৃদ্ধি অর্জনের সুযোগ আরো বৃহৎ পরিসরে উন্মুক্ত হয়েছে। বিশাল এ জলরাশিকে দেশের জন্য সবচেয়ে সম্ভাবনাময় এবং ভবিষ্যত অর্থনীতির প্রাণশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। মূলত এ জলজ সম্পদের সর্বোত্তম ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জাতীয় অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা সম্ভব। এছাড়া টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে সাগর উন্নয়ন ও ব্যবহারের প্রতি যথেষ্ট গুরত্বারোপ করা হয়েছে। ফলে ভবিষ্যত দেশ বিনির্মাণে সমুদ্রসম্পদ সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণই এই সময়ের বড় চ্যালেঞ্জ।

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের দায়িত্বশীল আহরণ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রমে ইতোমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য সমুদ্রে ৬৫ (পঁয়ষট্টি) দিন বাণিজ্যিক ট্রলারে মাছ আহরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় মাছ ইলিশের প্রজনন নিশ্চিত করার জন্য ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে আভ্যন্তরীন নদ-নদীর পাশাপাশি সমুদ্রেও ২২ (বাইশ) দিন সকল ধরণের মৎস্য নৌযান ও ট্রলারের মাধ্যমে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অপরদিকে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অন্যতম নিয়ামক ব্লু-ইকোনমির বা সমুদ্রভিত্তিক অর্থনীতিতে বাংলাদেশ পাইলট কান্ট্রি হিসেবে যুক্ত হয়েছে। পাশাপাশি সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সহনশীল আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে বাংলাদেশ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দেশের সাথে জোটবদ্ধ হয়েছে।

সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর ও সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট বিগত এক দশকেরও বেশি সময়ের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক যে আহরণ গতিধারা এ প্রকাশনায় ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছে, আমি মনে করি তা স্বার্থক। কেননা এখান থেকে এতদবিষয়ে সংশ্লিষ্ট অংশিজনদের জন্য বঙ্গোপসাগরের বিশাল মৎস্য সম্পদের ব্যবস্থাপনা কিংবা গবেষণার নতুন দিগন্ত উম্মোচিত হবে। এছাড়া সমুদ্র বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নেও এ প্রকাশনা সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস। সবশেষে এ প্রতিবেদন প্রণয়ন, প্রকাশনা ও সম্পাদনায় যুক্ত সকলকে সাধুবাদ জানাই।

(কাজী শামস আফরোজ)

সূচিপত্র

সার-সংক্ষেপ			
১ম অধ্যায়- বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ			
১.০	ভূমিকা		
১.১	এক নজরে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ বিষয়ক তথ্যাদি		
১.২	সামুদ্রিক মৎস্য ও মৎস্য জাতীয় প্রজাতির বিবরণ		
১.৩	মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত জাল ও সরঞ্জামাদি		
১.৪	উপকূলীয় মৎস্য অবতরণকেন্দ্র		
১.৫	মৎস্য আহরণে নিয়োজিত উপকূলীয় জনগোষ্ঠী		
২য় অধ্যায়- সামুদ্রিক মৎস্যের জরিপ ও আহরণ খাতের ক্রমবিকাশ			
২.০	ভূমিকা		
২.১	সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ জরিপের প্রাথমিক পর্যায়		
	২.১.১	সামুদ্রিক জৈব জরিপ ও মৎস্য সম্পদ জরিপ	
২.২	সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের মজুদ নির্ধারণ		
	২.২.১	তলদেশীয় ও চিংড়ি মাছের মজুদ নিরূপণ	
	২.২.২	পেলাজিক মাছের মজুদ নিরূপণ	
২.৩	বর্তমানে 'আর ভি মীন সন্ধানী' জাহাজের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ জরিপ		
	২.৩.১	এক নজরে গবেষণা জাহাজ মীন সন্ধানী	
	২.৩.২	বঙ্গোপসাগরে আরভি মীন সন্ধানী পরিচালিত জরিপ কার্যক্রম	
	২.৩.৩	আর ভি মীন সন্ধানী জাহাজে গবেষণা কার্যক্রমের পর্যায় ক্রমিক ধাপ	
	২.৩.৪	আর ভি মীন সন্ধানী জাহাজের জরিপ কাজের ফলাফল (জুন ২০২১ পর্যন্ত)	
	২.৩.৫	আর ভি মীন সন্ধানী জাহাজে মৎস্য সম্পদের মজুদ বহির্ভূত অন্যান্য গবেষণা কার্যক্রম	
২.৪	বর্তমানে অবতরণ কেন্দ্রভিত্তিক উপকূলীয় মৎস্য সম্পদ জরিপ		
	২.৪.১	অবতরণ কেন্দ্রভিত্তিক জরিপের প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য	
	২.৪.২	সমুদ্র উপকূলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র	
	২.৪.৩	মৎস্য জরিপের জন্য নির্বাচিত মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র	
	২.৪.৪	নির্ধারিত তথ্য সংগ্রহ কর্মসূচী:	
	২.৪.৫	অবতরণকৃত বা আহরিত মাছের দৈর্ঘ্য, ওজন ও পরিমাণ নিরূপন	
	২.৪.৬	তথ্য সংগ্রহ কাজের আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি	
	২.৪.৭	তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ও পরিমাণ	
	২.৪.৮	কার্যপ্রণালী	
২.৫	বঙ্গোপসাগরে বাণিজ্যিক মৎস্য আহরণেরণের ক্রমবিকাশ ও বর্তমান অবস্থা		
	২.৫.১	বাণিজ্যিক মৎস্য আহরণ	
	২.৫.১.১ চিংড়ি ট্রলার		
	২.৫.১.২ মৎস্য ট্রলার বা ডিমার্সেল ট্রলার		
	২.৫.১.৩ মিডওয়াটার ট্রলার		
৩য় অধ্যায়- সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম			
৩.১	সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর		
	৩.১.১	লাইসেন্সিং কার্যক্রম	

		৩.১.১.২ যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান	
		৩.১.১.৩ আর্টিসনাল মৎস্য নৌযান	
		৩.১.২ বাণিজ্যিক ট্রলার ও মৎস্য নৌযান মনিটরিং, কন্ট্রোল এবং সার্ভেল্যান্স কাযর্ক্রম	
		৩.১.২.১ বাণিজ্যিক ট্রলার মনিটরিং, কন্ট্রোল এবং সার্ভেল্যান্স	
		৩.১.২.২ যান্ত্রিক ও আর্টিসনাল মৎস্য নৌযান মনিটরিং, কন্ট্রোল ও সার্ভেল্যান্স	
		৩.১.৩ ট্রলার ও নৌযান পরিদর্শনে বিভিন্ন সংস্থার সাথে যৌথ কার্যক্রম	
		৩.১.৪ মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম	
৩.২	সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট এর কার্যক্রম		
৪র্থ অধ্যায়- সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের আহরণ গতিধারা			
৪.১	২০১০-১১ অর্থ বছর পূববর্তী মৎস্য উৎপাদন		
৪.২	২০১০-১১ অর্থ বছর পরবর্তী মৎস্য উৎপাদন		
৪.৩	উপকূলীয় ও ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য আহরণের গতিধারা		
৪.৪	বাণিজ্যিক ট্রলারে মৎস্য আহরণের গতিধারা		
৪.৫	বেহুন্দী জাল (SBN) এ মৎস্য আহরণের গতিধারা		
৫ম অধ্যায়- সামুদ্রিক মৎস্য আইন এবং সামুদ্রিক মৎস্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি			
৫.১	সামুদ্রিক মৎস্য আইন ২০২০		
৫.২	IUU মৎস্য আহরণ		
৫.৩	আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সনদ বা চুক্তিতে বাংলাদেশ		
৬ষ্ঠ অধ্যায়- সামুদ্রিক মাছের প্রধান প্রজনন মৌসুম নির্ধারণ			
৬.১	প্রজনন মৌসুম নির্ধারনের উদ্দেশ্য		
৬.২	কার্যপদ্ধতি		
৬.৩	গবেষণায় প্রাপ্ত জিএসআই ও হিস্টোলজি বিশ্লেষণ ভিত্তিক ফলাফল		
৭ম অধ্যায়- বঙ্গোপসাগরের মৎস্যসম্পদ এর টেকসই ও সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে সাসটেইনেবল কোস্টাল এ্যান্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্প			
৭.১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য		
৭.২	প্রকল্পের কার্যক্রম		
৮ম অধ্যায়- বঙ্গোপসাগরের মাছের খাদ্যাভ্যাস ও আবাস			
৮.১	মাছের খাদ্যাভ্যাস		
৮.২	মাছের আবাস		
৮.৩	মাছের আবাসস্থল পরিবর্তন/সংকোচন		
৯ম অধ্যায়- মৎস্য আহরণে বেহুন্দি জালের ক্ষতিকর প্রভাব, নির্ভরশীল জেলে সম্প্রদায়, সমস্যা ও সুপারিশ			
৯.১	বেহুন্দি জালের ব্যবহার পদ্ধতি		
৯.২	বেহুন্দি জালের ক্ষতিকর প্রভাব		
৯.৩	বেহুন্দি জালের উপর জীবিকা অর্জনে নিয়োজিত মৎস্যজীবি ও তাদের সমস্যা		
৯.৪	বেহুন্দি জাল সম্পর্কিত সুপারিশ		
১০ম অধ্যায়- ব্লু ইকোনমি কর্ম পরিকল্পনায় সামুদ্রিক মৎস্য খাত			
১০.১	সামুদ্রিক মৎস্য (Marine Fisheries Management) ব্যবস্থাপনার জন্য কর্মপরিকল্পনা		
১০.২	মেরিকালচার (Mariculture) উন্নয়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা		
তথ্যসূত্র			

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ বৈচিত্রপূর্ণ জীববৈচিত্রে সমৃদ্ধ বিশাল সামুদ্রিক জল সম্পদের অধিকারী এবং সুনীল অর্থনীতির বিকাশে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। বঙ্গোপসাগরে ২৩৫ টিরও বেশি বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলার এবং ৬৭,০০০ টিরও বেশি আর্টিসেনাল মাছ ধরার নৌকা সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে নিয়োজিত। সামুদ্রিক মাছের উৎপাদনে আর্টিসেনাল খাতের অবদান ৮২.৮৬% (৫.৫৬ লক্ষ মেট্রিক টন) এবং বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলার এর অবদান ১৭.১৪% (১.১৫ লক্ষ মেট্রিক টন)। বিগত তিন দশকে, ১৯৮৩-৮৪ সাল থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১.৬৫ লাখ মেট্রিক টন মোট সামুদ্রিক উৎপাদন বেড়ে ৬.৭১ লাখ মেট্রিক টন হয়েছে। সরকার সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান মনিটরিং, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি (MCS) সহ ক্যাচ মনিটরিং, সেন্টমার্টিন দ্বীপ ও সুন্দরবন ম্যানগ্রোভকে অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষণার মতো বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বঙ্গোপসাগরে ১৭৩৮ বর্গকিলোমিটারের মধ্যে ৬৯৮ বর্গ কিমি সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা (MPA) ঘোষণা এবং সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রজনন ক্ষেত্র রক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা (১৪.৫.১) অর্জনের জন্য আরেকটি MPA ঘোষণার পর্যায়ে রয়েছে।

সামুদ্রিক মাছ ও মৎস্যজাত পণ্য বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রপ্তানি পণ্য। বাংলাদেশ থেকে প্রধানত চিংড়ি এবং বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছ যেমন- সামুদ্রিক বাস, দাতিনা, রুপচান্দা, কাটল ফিশ এবং কাঁকড়া ও কুচিয়া রপ্তানি করা হয়। এগুলো ছাড়াও শুটকি মাছ, হাঙ্গর, ফিনফিশ স্কেল ও চিংড়ির খোসা রপ্তানি করা হয়। বাংলাদেশের মাছ ও মৎস্যজাত পণ্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, রাশিয়া, চীন প্রভৃতি সহ ৫০টিরও বেশি দেশে রপ্তানি করা হয়। ইইউ দেশগুলো বাংলাদেশের মাছ ও মৎস্যজাত পণ্যের প্রধান আমদানিকারক। বিগত ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ ৭০,৯৪৫.৩৯ মেট্রিক টন মাছ ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ৩৯৮৫.১৫ কোটি টাকা আয় করেছে।

বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার দূরদর্শী লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনা ও গতিশীল নেতৃত্বে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সঠিক পথে রয়েছে। জাতির উন্নয়নের স্বপ্নকে গতিশীল করতে 'রূপকল্প ২০২১'-এর ধারায় 'রূপকল্প ২০৪১' গৃহীত হয়েছে। এর লক্ষ্য হচ্ছে নিরঙ্কুশ দারিদ্র্যের অবসান ঘটানো এবং ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের মর্যাদায় উন্নীত করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পথে দারিদ্র্য দূরীকরণ। অধিকন্তু, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ, উন্নত ও দারিদ্রমুক্ত রাষ্ট্রে পরিণত করা। নীতিনির্ধারক, বেসরকারি খাত, একাডেমিয়া, সংস্থা এবং উন্নয়ন অংশীদারদের মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যমে সমষ্টিগত, সমগ্র সমাজ পরিকল্পনা, অভিযোজন, কর্ম এবং শিক্ষার জন্য একটি অভিযোজিত জাতীয় ব্যবস্থা তৈরিতে সরকারকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে, বাংলাদেশের দ্রুত বর্ধনশীল মৎস্য খাতের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনাকারী, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, গবেষক এবং উন্নয়ন সহযোগীদের জন্য এই বর্ষপুস্তকটি একটি নির্দেশিকা হিসেবে তৈরি করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন ভাবনা শীর্ষক এ বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদনে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সাম্প্রতিক আহরণ গতিধারা, প্রেক্ষাপট এবং সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বর্ণিত হয়েছে। এ সেক্টরের সাথে সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবী, বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা, গবেষক, নীতিনির্ধারক, পরিকল্পনাবিদ এবং এ সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা ও বিজ্ঞানীবৃন্দ এ প্রকাশনা হতে উপকৃত হবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই শ্রদ্ধেয় মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর মহোদয় এর প্রতি তার সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা, আন্তরিক তত্ত্বাবধান ও মূল্যবান পরামর্শের জন্য। আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের সকল সহকর্মীদের প্রতি, এই প্রকাশনার তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ এবং প্রণয়ন জুড়ে তাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা, আন্তরিক সহযোগীতার জন্য।

(ড. মোঃ শরীফ উদ্দিন)

সার-সংক্ষেপ

খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র বিমোচন ছাড়াও বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য সেক্টর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে এদেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে স্বীকৃত এবং এর গুরুত্ব ও পরিসর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের মধ্যে রয়েছে ৪৭৫ প্রজাতির মাছ, যার মধ্যে রয়েছে ৫৩ প্রজাতির কোমলাস্থি মাছ, ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি, ১৫ প্রজাতির কাঁকড়া, ৭ প্রজাতির স্কুইড ও কাটল ফিশ, ৫ প্রজাতির কাছিম, ১৩৩ প্রজাতির সামুদ্রিক শৈবাল, ৩০১ প্রজাতির শামুক-ঝিনুকসহ অন্যান্য সামুদ্রিক সম্পদ। আমাদের দেশে বানিজ্যিক মৎস্য ট্রলার কর্তৃক আহরিত মৎস্য সম্পদের মধ্যে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ৩০টি গোত্রের ৯০টির অধিক মৎস্য ও চিংড়ি প্রজাতি রয়েছে। এর মধ্যে সার্ডিন, ইলিশ, পোয়া মাছ, দাতিনা, গ্রুপার, ক্যারানজিড, চিংড়ি ও কাঁটামাছ অন্যতম। তাছাড়া আর্টিসেনাল ফিশারিজে আহরিত প্রধান মৎস্য সম্পদের মধ্যে ইলিশ, লটিয়া, চিংড়ি, পোয়া মাছ, রূপচান্দা ও কাঁটামাছ বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন।

মৎস্য অধিদপ্তরাধীন চট্টগ্রামস্থ সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট গবেষণা জাহাজ ভিত্তিক মৎস্যসম্পদ জরিপ, গবেষণা ও মজুদ নির্ণয়ের পাশাপাশি বর্তমানে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা হতে নির্ধারিত মৎস্য অবুরণ কেন্দ্রভিত্তিক জাল ও মাছের বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত নিয়মিভাবে সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে যাচ্ছে। গত ২০১৯-২০ অর্থবছরে সামুদ্রিক মাছের মোট উৎপাদন ৬,৭১,১০৪ মে. টনে উন্নীত হয়েছে, তন্মধ্যে বানিজ্যিক মৎস্য সেক্টরের অবদান ১,১৫,৩৫৪ মে.টন (শতকরা ১৭.৪৯ ভাগ) এবং আর্টিসেনাল সেক্টরের অবদান ৫,৫৫,৭৫০ মে. টন (শতকরা ৮২.৫১ ভাগ)। বিগণ ২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০ অর্থ বছর পর্যন্ত সামুদ্রিক মাছের আহরণ গতিধারা বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, দশ বছরে সামগ্রিক ভাবে সামুদ্রিক মাছের উৎপাদন ২২.৮৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্তমানে দেশে ৩৩টি চিংড়ি ট্রলার, ৪৯টি বটম ট্রলার, ৩১টি ট্রায়াল ভিত্তিক ট্রলার ও ১২১টি মিডওয়াটার ট্রলার এবং ৩০ হাজারের অধিক যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে নিয়োজিত রয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণে অনুমতিপ্রাপ্ত ২৬২টি ট্রলারের মধ্যে বর্তমানে বিভিন্ন প্রকৃতির সারা বছরে কম-বেশী ২২৫টি বাণিজ্যিক ট্রলার নিয়োজিত থাকে। এ সকল ট্রলারের মধ্যে চিংড়ি ট্রলার, বটম বা ডিমার্সেল ট্রলার, মিডওয়াটার ট্রলার ও ট্রায়াল ট্রলার (বটম প্রকৃতির) অন্তর্ভুক্ত। সময়ের পরিসরে বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলার কর্তৃক আহরিত অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য প্রজাতির গোত্র ভিত্তিক প্রাচুর্যতার ব্যাপক তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।

ইতোপূর্বে সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট এর নিয়ন্ত্রণাধীন "আর. ভি. অনুসন্ধানী" ও "আর. ভি. মাছরাঙ্গা" জাহাজ দুটির মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের জরিপসহ তলদেশীয় মাছ, উপরিস্তরের মাছ ও চিংড়ির মজুদ এবং সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণ মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। জাহাজ দুটির আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে যাওয়ায় এবং মেরামতের অযোগ্য হয়ে পড়ায় ২০০১ খ্রি. এর পর ভেসেল বেজড জরিপ পরিচালনা বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে জরিপ কার্যক্রমকে অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে 'আর. ভি. মীন সন্ধানী' নামে একটি আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন গবেষণা ও জরিপ জাহাজ ক্রয় করা হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও মৎস্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে সায়েন্স টিম গঠনের মাধ্যমে নভেম্বর ২০১৬ খ্রি. হতে উক্ত গবেষণা জাহাজ দ্বারা বঙ্গোপসাগরে মৎস্য সম্পদের ভেসেল বেজড জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাণিজ্যিক সেক্টরের মৎস্য উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আর্টিস্যানাল সেক্টরের আনুপাতিক অবদান হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য বাণিজ্যিক ট্রলারে আহরিত মাছের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যবান, ছোট আকারের এবং মাছের প্রজাতির প্রাচুর্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এমতাবস্থায়, ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মাধ্যমে মুল্যবান প্রজাতির প্রাপ্যতা বাড়াতে সমুদ্র ও উপকূলীয় মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সর্বোচ্চ সহনশীল মৎস্য আহরণে উপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ

১.০ ভূমিকা

বৈচিত্রময় জলজ সম্পদে ভরপুর বাংলাদেশের দক্ষিণে বিস্তৃত রয়েছে ফানেল আকৃতির বঙ্গোপসাগর। সমুদ্রসীমানা নিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশসমুহের সাথে শান্তিপূর্ণ বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে ১১৮,৮১৩ বর্গ কি.মি. জলাশয়ে দেশের সার্বভৌম একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সমুদ্রভিত্তিক অর্থনৈতিক (Blue Economy) সমৃদ্ধি অর্জনের সুযোগ আরো বৃহৎ পরিসরে উন্মুক্ত হয়েছে। বিশাল এ জলরাশিকে দেশের জন্য সবচেয়ে সম্ভাবনাময় এবং ভবিষ্যত অর্থনীতির প্রাণশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। মূলত এ জলজ সম্পদের সর্বোত্তম ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জাতীয় অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা সম্ভব। এছাড়া টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে সাগর উন্নয়ন ও ব্যবহারের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ফলে ভবিষ্যত সমৃদ্ধ দেশ বিনির্মাণে সমূদ্রসম্পদ সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণই এই সময়ের বড় চ্যালেঞ্জ।

আমাদের দেশের মৎস্য সেক্টর মুলতঃ মিঠা পানির অভ্যন্তরীণ মৎস্য সম্পদ এবং সামুদ্রিক সম্পদ এ দুভাগে বিভক্ত। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণ প্রক্রিয়া আবার ২টি ধারায় বিভক্ত। একটি হলো ক্ষুদ্রায়তন উপকূলীয় ফিশারী (Artisanal Fisheries) এবং অন্যটি হলো বাণিজ্যিক ফিশারী (Industrial Fisheries)। সমুদ্র উপকূলীয় জলসম্পদের বৃহৎ ও বিস্তৃত অগভীর এলাকা একদিকে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যজীবীদের মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র যা আর্টিসেনাল ফিশারিজের অন্তর্ভুক্ত এবং অন্যদিকে মৎস্য ও চিংড়ির নানা প্রজাতির বিচরণভূমি তথা অনেক প্রজাতির প্রজনন ক্ষেত্রও বটে। এ কারণে বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশ অংশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রজাতির মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া, স্কুইড ও কাটল ফিস, কাছিম, শামুক-ঝিনুক, সামুদ্রিক শৈবালসহ অন্যান্য জলজ সামুদ্রিক সম্পদ পাওয়া যায়। এছাড়া একচ্ছত্র অর্থনৈতিক সমুদ্র সীমার (Exclusive Economic Zone) অপেক্ষাকৃত গভীর অঞ্চলের (৪০ মি. এর উর্ধ্বে) অনাহরিত মাছ যথাযথ পদ্ধতিতে সহনশীল আহরণ নিশ্চিত করতে পারলে এ থেকেও অর্থনৈতিকভাবে অধিকতর লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

দেশের অর্থনীতিতে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের ব্যাপ্তি উপকূলীয় বিশাল জনগোষ্ঠির জীবিকায়নের নিরাপত্তা বলয় অতিক্রম করে খাদ্য নিরাপত্তা, বিশেষ করে পুষ্টি যোগানে সারা দেশে দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। এছাড়া উপকূলীয় ও সামুদ্রিক অঞ্চলে মৎস্য আহরণ ও ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন সহায়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য শিল্পে মহিলাদের ক্ষমতায়ণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে। এদেশের সমুদ্রসীমায় জীববৈচিত্রের এক বিশাল সমাহার রয়েছে। দেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন বিভিন্ন প্রজাতির একুয়ারিয়াম মৎস্যসহ (বাহারী মাছ) প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেও এক চারণ ক্ষেত্র, যা দেশ-বিদেশের পর্যটকদের নিকট মনোরম বিনোদন কেন্দ্র। অন্যান্য দ্বীপসমুহ সহ সুন্দরবন এবং এর পারিপার্শ্বিক লবনাক্ত জলাশয়ের পরিবেশ ও পরিবেশগণ অন্যান্য বৈশিষ্ট্য এবং জীববৈচিত্র সংরক্ষণ বঙ্গোপসাগরকে করেছে বিশ্বের নজরকাড়া মৎস্য ভান্ডার।

বাংলাদেশের সমুদ্র ও নদীমোহনার পানিতে ১৩৩ গোত্রের ৪৭৫ প্রজাতির মাছ (১৯৮৩) কর্তৃক সমুদ্র ও স্বল্পলোনাপানি থেকে শনাক্তকৃত ১৬৯ প্রজাতির মাছের মধ্যে ৫৯ গোত্রভূক্ত ১৪৮ প্রজাতির মাছ অস্থিময় ও ১০ গোত্রভূক্ত ২১ প্রজাতির মাছ কোমলাস্থি বিশিষ্ট। এদের মধ্যে বেশির ভাগই সামুদ্রিক Perch-জাতীয় (৩০ গোত্রের ৬৩ প্রজাতি) মাছ। এরপর রয়েছে Herring ও Shad (৩ গোত্রভুক্ত ২১ প্রজাতি), Catfish (৩ গোত্রভূক্ত ১৯ প্রজাতি) ও Flatfish (৫ গোত্রভুক্ত ১৬ প্রজাতি)। সমুদ্র থেকে আহরিত মাছের শতকরা ৬০ ভাগ হলো ইলিশ। বাংলাদেশের সামুদ্রিক এলাকায় রয়েছে ১০ প্রজাতির হাঙ্গর। সামুদ্রিক মাছের প্রায় ৬৫% বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

১.১ এক নজরে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ বিষয়ক তথ্যাদি

১। উপকূলীয় তটরেখা	: ৭১০ কি.মি.
২। একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল (ইউজ)	: ১,১৮,৮১৩ বর্গ কি.মি.
৩। প্রধান মৎস্য ক্ষেত্র	: ৪ টি (১৭,১৩৮ বর্গ কি.মি.)
	ক) সাউথ প্যাসেজ: ৬,২০০ বর্গ কি.মি (কক্সবাজারের অদূরে)
	খ) সাউথ অব সাউথ প্যাসেজ: ২,৫৩৮ বর্গ কি.মি (সেন্ট মার্টিন দ্বীপের দক্ষিণে)
	গ) মিডল গ্রাউন্ড : ৪,৬০০ বর্গ কি.মি. (পটুয়াখালীর দক্ষিণে)
	ঘ) সোয়াচ অফ নো গ্রাউন্ড : ৩,৮০০ বর্গ কি.মি. (দুবলা দ্বীপের দক্ষিণে)

৪। সামুদ্রিক মৎস্য অভয়াশ্রম (Marine Reserve) : সমুদ্রে ৬৯৮ বর্গ কি.মি.

: উপকূলীয় অঞ্চলে ৩,১৮৮ বর্গ কি.মি (নিঝুম দ্বীপ সংলগ্ন)

৫। সামুদ্রিক মৎস্য মজুদের পরিমাণ (১৯৮৪ সালের তথ্যানুযায়ী)

ক) তলদেশীয় মজুদ ১,৮৫,০০০ মে.টন।

খ) ভাসমান মজুদ ৬০,০০০ – ১,২০,০০০ মে.টন।

গ) চিংড়ি ৪,০০০ মে.টন।

৬। বাণিজ্যিক ভাবে আহরিত মৎস্য প্রজাতি : ইলিশ, লাউখ্যা, রুপচান্দা, ছুরি, লইট্যা, রাঙ্গাচৌখা, ফাইস্যা, পোয়া, কাটা, বাইলা, চৌক্কা, দাতিনা ইণ্যাদি।

৭। বাণিজ্যিক ভাবে আহরিত চিংড়ি প্রজাতি : বাগদা, চাপা, চামা, হরিনা, লইল্যা, রুডা ইণ্যাদি।

৮। সম্ভাবনাময় মৎস্য প্রজাতি ও সম্পদ : টুনা ও টুনা জাতীয় মাছ, হেরিং, মৌরি, সারডিন, হাঙ্গর, নুইল্যা, চেয়াই, অক্টোপাস, কাঁকড়া, লবষ্টার, সামুদ্রিক শৈবাল ইণ্যাদি।

৯। সামুদ্রিক মৎস্যজীবির সংখ্যা : ৫.১ লক্ষ (প্রায়)।

১০। নদীর মোহনা : নাফ, কর্ণফুলী, মাতামুহুরী, মহেশখালী চ্যানেল, ফেনী, মেঘনা, হাতিয়া এবং সাহাবাজপুর নদী।

১১। বার্ষিক মৎস্য আহরণের পরিমাণ (২০১৯ – ২০২০)

: ইন্ডাস্ট্রিয়াল ঃ ১,১৫,৩৫৪ মে.টন

: আর্টিস্যানাল ঃ ৫,৫৫,৭৫০ মে.টন

: মোটঃ ৬,৭১,১০৪ মে.টন

১২। মৎস্য আহরণের সরঞ্জাম : ক) ট্রামেল জাল ঃ ৪২২ টি

খ) ফাঁস জাল ঃ ৬,৩৮৯ টি

গ) বেহুন্দী জাল ঃ ৬৬,৯২৭ টি

ঘ) বড়শী ঃ ২,০৮৪ টি

ঙ) অন্যান্য জাল ঃ ২,২২২ টি

১৩। উপকূলীয় জেলার সংখ্যা : ১৪ টি

১৪। প্রধান দ্বীপ সমূহ : সেন্টমার্টিন, শাহপুরী, মহেশখালী, সন্দ্বীপ, কুতুবদিয়া, সোনাদিয়া, হাতিয়া, মনপুরা, ভোলা, সোনারচর, দুবলার চর।

১.২ সামুদ্রিক মৎস্য ও মৎস্য জাতীয় প্রজাতির বিবরণ

ভারত মহাসাগরের উত্তরে অবস্থিত বঙ্গোপসাগর একটি বৃহত্তম উপসাগর। এই উপসাগরের উত্তরে বাংলাদেশ, ভারত ও মায়ানমারের অবস্থান। নদীমাতৃক এ দেশে অসংখ্য নদ-নদী জালের ন্যায় ছড়িয়ে রয়েছে। বঙ্গোপসাগর বিশ্বের একমাত্র উপসাগর যেখানে সবচেয়ে বেশী নদী বিধৌত পানি প্রবেশ করে মৎস্যসম্পদের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এজন্য বঙ্গোপসাগর বৈচিত্র্যপূর্ণ মৎস্যসম্পদে সমৃদ্ধশালী।

১.৩ মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত জাল ও সরঞ্জামাদি

বাংলাদেশের আদি মৎস্যজীবী সম্প্রদায় হিন্দু ধর্মাবলম্বী 'জলদাস' বা 'কৈবর্ত্য' শ্রেণির। এ সকল মৎস্যজীবীরা নানা ধরণের মাছ ধরার জাল-সরঞ্জামাদি উদ্ভাবন করে মৎস্য আহরণে ভূমিকা রেখেছে। পরবর্তীকালে মাছের চাহিদা ও বাজার মূল্য বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র হিসেবে মৎস্যচাষ ও মৎস্য আহরণ উপযোগী মনে হওয়ায় স্থানীয় মুসলমানসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা মুক্ত জলাশয়ে ও উপকূলীয় অঞ্চলে মৎস্য আহরণে উৎসাহী হয়ে উঠে। এদিকে বিদেশী একতন্তু বিশিষ্ট (Monofilament) উন্নত ও কার্যকর আহরণ ক্ষমতাসম্পন্ন জালের আমদানীর ফলে সূতার জালের ব্যবহার বাড়তে থাকে। এতে যোগ হয় নানা আকারের বড়শি। একসময় দেশেই তৈরি হতে থাকে নানা আকারের ফাঁস জাল। ফলে একশ্রেণীর লোভী ব্যবসায়ীর লালসার কারণে বিভিন্ন প্রকারের জাল-মৎস্য আহরণ সরঞ্জামাদির অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার মুক্ত জলাশয়ের মৎস্যসম্পদের জন্য হুমকী হয়ে দেখা দেয়। মৎস্যসম্পদ রক্ষায় সরকার জাল-সরঞ্জামাদির আকার-প্রকার ও ব্যবহারের মৌসুম নির্ধারণ করে বিধি-বিধান প্রণয়ন করে।

উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে প্রধানুঃ নানা আকারের ফাঁস জাল (Gill net) ও বেহুন্দি জাল (Set bag net) ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও রয়েছে টানা জাল (Seine net) এবং বিভিন্ন মাপের বড়শি (Hook and Line, Long line) ও নানা ধরনের 'চাঁই' বা 'ফাঁদ' (Trap)। ফাঁস জাল আবার দুই ধরণের-ভাসাজাল (Drift gill net) ও ডুবা জাল (Bottom set gill net)। ফাঁসের মাপ ও আকারভেদে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন স্থানীয় নামে ফাঁস জালের পরিচিতি রয়েছে, যেমন- ইলিশ জাল, ছান্দি জাল, কাঠিজাল, টংজাল, কোরাল জাল, লাক্ষ্যা জাল, হাঙ্গর জাল, বাটাজাল, ফইল্যা জাল, পোয়াজাল, ফাঁইস্যাজাল, হুন্দ্রাজাল, ডুবাজাল, তিন-পরল্যা জাল ইণ্যাদি। যে জালে যে মাছ বেশী ধরা পড়ে সেসব মাছের নামেও ফাঁস জালের পরিচিতি রয়েছে। বেহুন্দি জালও মৎস্য আহরণ অঞ্চল ও আকারগণ কারণে নানা নামে পরিচিত, যেমন-বাধাজাল, বিন্দি জাল। মোহনা ও উপকূলীয় নদীনালায় ছোট আকারের যে বেহুন্দি জাল পাতা হয় সেগুলোকে 'মোহনা বেহুন্দি জাল' বলে এবং অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী ও কিছুটা গভীর সমুদ্রে যে বড় আকারের বেহুন্দি জাল দিয়ে মাছ ধরা হয় সেগুলোকে 'সাগর বেহুন্দি জাল' বলা হয়। অঞ্চলভেদে টানাজাল মোহনায় ও দ্বীপ এলাকায় মাছ ধরার জন্য ব্যবহার করা হয়। 'বড়শি' ও 'হাজারী বড়শি' নামে যান্ত্রিক নৌযান দ্বারা বানিজ্যিকভাবে সমুদ্রে মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত হয় যেখানে হাঙ্গর ও পোয়া মাছ ধরাই প্রধান লক্ষ্য।

১.৪. উপকূলীয় মৎস্য অবুরণকেন্দ্র

যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের মাধ্যমে প্রতিদিন সমুদ্র থেকে বিপুল পরিমান মাছ আহরিত হয়। উপকূলীয় এলাকায় অবস্থিত বহু সংখ্যক সরকারি-বেসরকারি অবুরণকেন্দ্রে এসব মাছ ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, খুলনা ও পাথরঘাটা (বরগুনা), বরিশালে সরকারি মৎস্য অবুরণ কেন্দ্রের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী অবুরণ কেন্দ্র রয়েছে। অননুমোদিত বা অঘোষিত বেসরকারি অবুরণকেন্দ্রসমুহে মাছের বাজার কতিপয় স্থানীয় আড়তদার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। বেসরকারি এ সকল মৎস্য অবুরণকেন্দ্র থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংখ্যক অবুরণকেন্দ্র বা ঘাটকে সরকারীভাবে তালিকাভুক্ত করে অবকাঠামোগণ উন্নয়ন যেমন- মাছ নামানোর জেটি, সাময়িকভাবে মাছ মজুদ রাখার জন্য ছাউনীওয়ালা পাকা জায়গা, বরফ ও পানি সরবরাহ এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর ফলে অবুরণকেন্দ্রসমূহে দৈনন্দিন মৎস্য অবুরণ এবং স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধা নিশ্চিত করতে পারলে একদিকে যেমন মাছের গুণাগুণ রক্ষা পাবে অন্যদিকে তেমনিভাবে প্রাকৃতিক উৎস্য থেকে আহরিত বিভিন্ন প্রজাতির মাছের প্রকার ও পরিমান সম্পর্কে সম্যক ধারনা পাওয়া সম্ভব হবে।

১.৫ মৎস্য আহরণে নিয়োজিত উপকূলীয় জনগোষ্ঠী

সমুদ্র তীরর্বুী অঞ্চল, মোহনাঞ্চল, দ্বীপাঞ্চল, প্যারাবনাঞ্চল এবং মিঠা পানির জলাশয়ের সক্রিয় জোয়ার-ভাটার প্রভাবি অংশকে উপকূলীয় অঞ্চলভূক্ত এলাকা হিসেবে ধরা হয়। উপকূলকে সংজ্ঞায়িত করা দুরূহ হলেও এটা সুস্পষ্ট যে উপকূলীয় এলাকার পানি হবে অপেক্ষাকৃত কম লবনাক্ত এবং এতে জোয়ার-ভাটার দৈনন্দিন প্রভাব পরিলক্ষিত হবে। উপকূলীয় এলাকার পানি যেহেতু সমূদ্রের পানির মতো অতি লবনাক্ত নয় আবার মিঠা পানির ন্যায় লবনাক্তহীনও নয়। সেহেতু এ অঞ্চলে গড়ে উঠেছে এক ভিন্ন ধর্মী পরিবেশ বা ব্যতিক্রমী ইকোলজি এবং সমৃদ্ধশালী জীববৈচিত্র। আর তাই উপকূলর্বুী এলাকায় গড়ে উঠে এক বিশেষ শ্রেণি বা সম্প্রদায়ের আবাসস্থল যারা জেলে সম্প্রদায় নামে খ্যাত এবং যাদের জীবন-জীবিকা দুটোই উপকূলের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এ সব জেলে সম্প্রদায় যান্ত্রিক বা অযান্ত্রিক নৌকা সহযোগে বিভিন্ন জাল, বড়শি ও ফাঁদ দ্বারা স্বল্প মুলধন ব্যয় করে উপকূলের কাছাকাছি এলাকায় মাছ ধরে। উপকূলীয় এলাকার মৎস্যজীবী বা জেলে সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

উপসংহার

বঙ্গোপসাগরের মাছ ও চিংড়ির মজুদ নিরুপণ ও সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণ কৌশল নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দেশ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত বিভিন্ন জরিপে মৎস্য ও চিংড়ির মজুদ ক্ষেত্র নির্ধারণ, তলদেশীয় মৎস্য ও চিংড়ির মজুদ নিরুপণ ও সহনশীল আহরণমাত্রা, পেলাজিক মাছের মজুদ ও ষ্ট্যান্ডিং স্টক সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। বঙ্গোপসাগরে সামুদ্রিক মৎস্য ও চিংড়ি সম্পদ মজুদের পরিমাণ ও সর্বোচ্চ আহরণ মাত্রা নিরুপণের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্ন ভাবে গৃহীত গবেষণা ও জরিপ কার্যক্রমের মাধ্যমে কিছুটা ধারণা পাওয়া গেলেও বিভিন্ন জরিপের ফলাফলে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়েছে যা দূরীভুত হওয়া প্রয়োজন।

সামুদ্রিক মৎস্যের জরিপ ও আহরণ খাতের ক্রমবিকাশ

২.০ ভূমিকা

বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য খাতের জরিপ ও গবেষণার ইতিহাস দীর্ঘ দিনের। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণ, সংরক্ষণ এবং বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সহনশীল পর্যায়ে আহরণ নিশ্চিত করে সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সালে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনা উত্তরকালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক ঘোষণায় পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সকল আঞ্চলিক অফিসকে বিভাগ হিসেবে মর্যাদা প্রদান করেন। ফলে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর বিভাগ হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। বিভাগটি একপর্যায়ে শিল্প বিভাগের অধীনস্থ একটি দপ্তর হিসেবে পরিচালিত হয়। অবশেষে বাস্তব প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর মৎস্য অধিদপ্তরের অধিনস্ত একটি দপ্তর হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে।

স্বাধীনা উত্তর সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর উদ্যোগ ও অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি বলেছিলেন 'মাছ হবে দেশের দ্বিতীয় প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী সম্পদ' (দৈনিক বাংলা, ৭ জুলাই ১৯৭২)। Territorial Water and Maritime Zone Act, 1974 আইন প্রনয়ণ করার মাধ্যমে তিনি সমুদ্র ও এর সম্পদ সমুহের উপর বাংলাদেশের সার্বভৌম অধিকার ও দাবি প্রতিষ্ঠিত করেন। এর ফলে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ ভূখন্ডের জলবায়ু ও মেরিটাইম জোনের আইনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিধানাবলী UNCLOS এ অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ১৯৮২ সালে অত্যন্ত অস্থিতিশীল উপকূল রেখার জন্য ডেল্টাইক বেস লাইনের UNCLOS নিবন্ধনগুলি ৭(২) বাংলাদেশ কে উদাহরণ ধরে প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া ১৯৭২ সালে সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উপহার হিসেবে প্রদত্ত ১০ টি সমুদ্রগামী ট্রলারের সাহায্যে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রথমবারের মত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মৎস্য আহরণ শুরু করে (DoF, ২০১৭)।

বাংলাদেশ ও জাপান সরকার এবং ইউএনডিপি এর অনুদানে ১৯৭৯ সালে "সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রকল্প" গৃহীত হয়। উক্ত প্রকল্পের সদর দপ্তর স্থাপন করা হয় চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে। তার অধীনে কক্সবাজারস্থ সামুদ্রিক জীববিদ্যা গবেষণাগার ন্যস্ত করা হয়। প্রকল্পটি ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে সংশোধিত "সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রকল্প" নামে দুই বৎসর মেয়াদী ২য় পর্যায়ে অনুমোদিত হয় এবং পরবর্তীতে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জুন পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বর্ধিত করা হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১৯৮০-৮৩ সালে গবেষণা জাহাজ "আর. ভি. অনুসন্ধানী" যোগে স্থানীয় গবেষকদের দ্বারা এবং ১৯৮৪-৮৭ মেয়াদে বিদেশী বিশেষজ্ঞবৃন্দের সাথে যৌথভাবে তলদেশীয় মাছ (Demersal) ও চিংড়ি এবং মহাসাগরীয় (Oceanic) বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ব্যাপক জরিপ ও গবেষণা কাজ সম্পন্ন হয়। প্রকল্পটি ১লা জুলাই ১৯৯৫ সালে "সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট" নামে স্থায়ী ভাবে সরকারের রাজস্ব খাতভূক্ত হয়।

আর. ভি. অনুসন্ধানী কর্তৃক ১৯৮০ সাল হতে ২০০১ সাল পর্যন্ত ৮৪টি এবং ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত আর. ভি. মাছরাঙ্গা কর্তৃক ২১টি জরিপ ক্রুজ সম্পন্ন করা হয়। পরবর্তীতে গবেষণা জাহাজদ্বয় মেরামতের অযোগ্য হয়ে পড়ায় জরিপ ক্রুজ পরিচালনা বন্ধ হয়ে যায়। তবে জরিপ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য ১৯৯৮ সাল থেকে সীমিত পর্যায়ে ল্যান্ড বেইজ্‌ড জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

সম্ভাবনাময় সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, আহরণ, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয় এবং সে সকল কমিটির মতামতের প্রেক্ষিতে সরকার মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে। "সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর সুযোগ সুবিধা ও তা বাস্তবায়নের সুপারিশ" এর নিমিত্তে ১৯৮৫ সালে কেবিনেট সচিব এম, এম, জামানকে সভাপতি করে ৮টি মন্ত্রণালয়ের সচিব সমন্বয়ে এবং ১৯৯৭ সালে চিংড়ি বিশেষজ্ঞ ডঃ মাহমুদুল করিমকে আহবায়ক করে ৮ সদস্য বিশিষ্ট "সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্য সম্পদের সম্ভাবনা ও সমস্যাসমুহ পর্যালোচনা পূর্বক সুপারিশমালা প্রনয়ণ" কমিটি গঠন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পাশাপাশি জরিপ কার্যক্রমকে অধিকতর গতিশীল করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত আগ্রহে ইসলামী ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (IDB), মালয়েশিয়া সরকার এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে 'আর. ভি. মীন সন্ধানী' নামে একটি আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন গবেষনা জাহাজ

মালয়েশিয়া থেকে ক্রয় করা হয়েছে যা নভেম্বর ২০১৬ হতে বঙ্গোপসাগরে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। ফলে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা গবেষণা জাহাজ ভিত্তিক জরিপ কার্যক্রম শুরু হয়েছে যা সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

২.১ সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ জরিপের প্রাথমিক পর্যায়

মাছের বংশ বৃদ্ধি ও মজুদ ঠিক রেখে যুগ-যুগ ধরে সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন অব্যাহত রাখতে প্রয়োজন সুষ্ঠু সংরক্ষণ। বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা, সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণ কৌশল নির্ধারনের জন্য প্রয়োজন মজুদ নিরূপন, যা একমাত্র গবেষণা ও জরিপের মাধ্যমেই সম্ভব।

২.১.১ সামুদ্রিক জৈব জরিপ ও মৎস্য সম্পদ জরিপ

স্বাধীনতাপূর্ব সময় থেকেই বঙ্গোপসাগরের জলসীমায় বিভিন্ন ধরণের জরিপ কার্যক্রম শুরু হয়। বিশেষ করে মৎস্য বা চিংড়ির মজুদ, বিস্তৃতি ও প্রাচুর্যতা নিরুপণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করার পাশাপাশি জলজ জীব সম্পদ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। জলজ জীব সম্পদের মধ্যে রয়েছে ফাইটোপ্লাংটন, জুপ্লাংটন, শৈবাল, মলাস্ক, প্রবাল, ক্রাস্টাশিয়া, একাইনোডার্মসহ বেনথিক প্রাণী, পাখি, কাছিম, ডলফিন, তিমি ও অন্যান্য জলজ প্রাণিগোষ্ঠি। এ সমস্ত জলজ জীবসমূহ সাগরের বিভিন্ন আবাসস্থল কিংবা পানির বিভিন্ন স্তরে বসবাস করে। জলজ জীবসমূহ মাছ ও চিংড়ির খাদ্য শৃঙ্খলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মৎস্য ও চিংড়ি প্রজাতি সমূহ সাগরের বিভিন্ন স্তরে বসবাস করে এদেরকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে বড় হয়ে থাকে। সাগরের বিভিন্ন গভীরতায় বা পানির স্তরে এ সমস্ত জীব সম্পদের প্রাচুর্যতা দেখে মৎস্য ও চিংড়ি প্রজাতি সমূহের অবস্থান সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা সম্ভব। সর্বপ্রথম জাপানী ফিশিং ভেসেল Chosui Maru, Kinki Maru এবং Kagawa Maru সর্বপ্রথম বঙ্গোপসাগরের বিভিন্ন Oceanographical তথ্য যেমন- তলদেশের আকৃতি, পানির স্রোত, ঘোলাত্ব ইত্যাদি জরিপ করে। সাথে সাথে বিভিন্ন জৈবিক তথ্য, প্রাথমিক উৎপাদক, সেকেন্ডারী উৎপাদক, চিংড়ি বা মাছের লার্ভা ইত্যাদিও জরিপ করে। FAO এর সহায়তায় ১৯৬২-৬৪ সালে FV Jalwa, ১৯৬৭-৭০ সালে রাশিয়ান রিসার্চ ভেসেল Lesnoi এবং ১৯৬৭-৭১ সালে BFDC এবং FAO এর যৌথ উদ্যেগে (UNSF, PAK-২২) "সাগর সন্ধানী" ও "মীন সন্ধানী" দ্বারা সর্বপ্রথম ধারাবাহিক ও নিরবচ্ছিন্ন (Comprehensive) জৈব জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে তিনটি প্রধান ফিশিং গ্রাউন্ড (South Patches, Middle Ground and Swatch of no Ground) নির্ণয় করা হয় যাদের আয়তন ১৫ হাজার বর্গ কি.মি.।

বঙ্গোপসাগরের মাছ ও চিংড়ীর মজুদ নিরূপণ ও সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণ কৌশল নির্ধারণের জন বিভিন্ন জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সংস্থা ও দেশ যেমন জাপান, নরওয়ে ও FAO-এর কারিগরি সহায়তায় ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৯০ সাল মেয়াদে বিভিন্ন জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। উক্ত সময়ে পরিচালিত বিভিন্ন জরিপে ৪টি মৎস্য ও চিংড়ী মজুদ ক্ষেত্র নির্ধারন, তলদেশীয় মৎস্য ও চিংড়ীর মজুদ নিরূপণ ও সহনশীল আহরণমাত্রা, পেলাজিক মাছের মজুদ ও ষ্ট্যান্ডিং স্টক সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়।

২.২ সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের মজুদ নির্ধারণ

বঙ্গোপসাগরে সামুদ্রিক মৎস্য বা চিংড়ি সম্পদ মজুদের পরিমাণ ও সর্বোচ্চ আহরণ মাত্রা নিরুপনের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্ন ভাবে গৃহীত অনুসন্ধানী কার্যক্রমের মাধ্যমে কিছুটা ধারণা পাওয়া গেলেও বিভিন্ন জরিপের ফলাফলে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়েছে। এ সকল জরিপ ফলাফলে মাছের মজুদ ও সর্বোচ্চ আহরণের পরিমাণ বিষয়ে নিম্নরূপ ধারণা পাওয়া যায় (টেবিল ১)।

২.২.১ তলদেশীয় ও চিংড়ি মাছের মজুদ নিরূপণ

মৎস্য বিশেষজ্ঞ Dr. WQB West ১৯৭৩ সালে জরিপের মাধ্যমে তলদেশীয় মাছের মজুদ ২,৬৪,০০০-৩,৭৩,০০০ মে.টন এবং সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণমাত্রা (MSY) ১,৭৫,০০০ মে.টন উল্লেখ করেন। Dr. Fridjof Nansen জাহাজ কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাদি বিশ্লেষণের মাধ্যমে Saetre ১৯৮১ সালে এ ১,৬০,০০০ মে. টন মজুদ এবং ১,০০,০০০ মে.টন MSY নিরূপণ করেন। আর. ভি. অনুসন্ধানী দ্বারা ১৯৮১-৮৩ সাল মেয়াদে সংগৃহিত তথ্যাদি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ১,৫২,০০০ মে. টন তলদেশীয় মাছের মজুদ এবং MSY ৪০,০০০-৫০,০০০ মে. টন এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

Dr. Pen, Rasid, White and Khan ১৯৮৩-১৯৮৫ সাল মেয়াদে গবেষণার মাধ্যমে চিংড়ীর মজুদ ৩,০০০-৪,০০০ মে. টন এবং MSY ৬,০০০-৭,০০০ মে.টন উল্লেখ করেন।

২.২.২ পেলাজিক মাছের মজুদ নিরূপণ

Dr. Fridjof Nansen জাহাজ দ্বারা ১৯৭৮-৭৯ সালে গবেষণার মাধ্যমে পেলাজিক মাছের মজুদ ৬০,০০০-১,২০,০০০ মে.টন নির্ধারণ করা হয়। ১৯৮৪-৮৬ সাল মেয়াদে পরিচালিত গবেষণা শেষে M. Lamboeuf ১৯৮৭ খ্রি: ১০ মি. গভীরতার উর্দ্ধে EEY অঞ্চলে ১,৮৮,০০০ মে. টন মৎস্য মজুদ নিরূপণ করেন, যার মধ্যে ২৫,৬০০ মে. টন ভাসমান মজুদ।

টেবিল ১: বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত জরিপ সমূহের সারসংক্ষেপ

বছর	জাহাজ/ এজেন্সী	মজুদ প্রকৃতি	মজুদ (মে. টন)	সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণ (মে. টন)
১৯৭৩ খ্রি.	BFDC এবং FAO এর যৌথ উদ্যোগে (UNSE PAK-২২) সাগর সন্ধানী ও মীন সন্ধানী দ্বারা Dr.WOB West (১৯৭৩) ডিমার্সাল মাছ	ডিমার্সাল মাছ	২,৬৪,০০০-৩,৭৩,০০০	১,৭৫,০০০
১৯৭৯-৮০ খ্রি.	FAO এর সহযোগিণায় নরওয়ে এর রিচার্স ভেসেল Dr. Fridjof Nansen এর মাধ্যমে Saetre (১৯৮১)	ডিমার্সাল মাছ	১,৬০,০০০	১,০০,০০০
১৯৮১-৮৩ খ্রি.	FAO/UNDP ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে আর ভি অনুসন্ধানী ও আর ভি মাছরাঙ্গা দ্বারা Dr. Khan ও অন্যান্য (১৯৮৯)	ডিমার্সাল মাছ	১,৫২,০০০	৪০,০০০- ৫০,০০০
১৯৮৪-৮৫খ্রি.	আর ভি অনুসন্ধানী ও আর ভি মাছরাঙ্গা দ্বারা Dr. Khan ও অন্যান্য (১৯৮৯), Lamboeuf (১৯৮৭)	ডিমার্সাল মাছ	১,৮৮,০০০	৪৮,০০০- ৮৯,০০০
১৯৭৮-৭৯ খ্রি.	FAO এর সহযোগিণায় নরওয়ে এর রিচার্স ভেসেল Dr. Fridjof Nansen এর মাধ্যমে Saetre (১৯৮১)	পেলাজিক মাছ	৬০,০০০-১,২০,০০০	-
১৯৮৩-৮৫খ্রি.	FAO/UNDP ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে আর ভি অনুসন্ধানী ও আর ভি মাছরাঙ্গা দ্বারা ডঃ পেন, রশিদ, হোয়াইট, খান ও অন্যান্য (১৯৮৯)	চিংড়ি	৩,০০০-৪,০০০	৬,০০০- ৭,০০০

২.৩ র্বুমানে 'আর ভি মীন সন্ধানী' জাহাজের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ জরিপ

স্বাধীনুা পরর্বুী সময়ে দেশের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব বিবেচনা করে দেশীয় গবেষণা জাহাজ দ্বারা সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তবে গবেষণা জাহাজদ্বয় মেরামতের অযোগ্য হয়ে পড়ায় জরিপ ক্রুজ পরিচালনা বন্ধ হয়ে যায়। অথচ পার্শ্বর্বুীদেশ ভারতসহ উন্নত বিশ্বের দেশগুলিতে ধারাবাহিকভাবে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে জরিপ কার্যক্রম অব্যাহত ভাবে পরিচালনা করে আসছে।

মূলতঃ নবায়নযোগ্য সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সঠিক মাত্রায় আহরণ, সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় সর্বাগ্রে প্রয়োজন প্রায়োগিক ও ধারাবাহিক গবেষণা। এ প্রেক্ষিতে বঙ্গোপসাগরে গবেষণা জাহাজের মাধ্যমে জরিপ কার্যক্রম পুণরায় শুরু করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ২০১৬ সালে ইসলামী ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (IDB) ও মালয়েশিয়া সরকারের সাথে যৌথ অর্থায়নে 'আর ভি মীন সন্ধানী' নামে একটি আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন গবেষনা জাহাজ ক্রয় করেছে। জাহাজটি বর্তমানে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় তিন ধরনের মৎস্য জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

২.৩.১ এক নজরে গবেষণা জাহাজ মীন সন্ধানী

গবেষণা জাহাজ 'আর ভি মীন সন্ধানী' মূলতঃ ২০০০ খ্রি. সালের পর থেকে বঙ্গোপসাগরে বন্ধ হয়ে যাওয়া সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ কার্যক্রমকে পূণরায় চালু, বর্তমানসময়ে সাগরে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের প্রাপ্যতা, উপস্থিতিসহ (Abundance) ক্রমবর্ধমান মৎস্য আহরণ চাপের (Fishing Pressure) সাথে এর সম্পর্ক নির্ণয় করতে বহুমাত্রিক মৎস্য জরিপের লক্ষ্যেই আনা হয়েছে। আর এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য জরিপ কার্যক্রমকে নিখুত করতে আধুনিক সকল সরঞ্জামাদি সজ্জিত 'আরভি মীন সন্ধানী' জাহাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলো:

জাহাজের নাম	আরভি মীন সন্ধানী
দৈর্ঘ্য	৩৭.৮ মিটার
প্রস্থ	৯.২০ মিটার
গভীরতা	৪.৬০ মিটার
ড্রাফ্‌ট	৩.২০ মিটার
ইঞ্জিন শক্তি	১৪০০ এইচপি
গ্রস টনেজ	৩৬৩ টন
জনবল ধারণ সুবিধা	২৮ জন
সাগরে অবস্থানের মেয়াদ	২৫ দিন

চিত্রঃ সাগরে ভাসমান গবেষণা জাহাজ মীন সন্ধানী

ছকে বর্ণিত কাঠামো ও সুবিধাদির পাশাপাশি জাহাজ পরিচালনার জন্য উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন যন্ত্রপাতি যেমন- RADAR, SONAR, Echo-Sounder, Gyro-compass সহ বিভিন্ন ধরণের জাল (Demersal Trawl Net, Pelagic Trawl Net and Shrimp Trawl Net) অপারেশনের জন্য আধুনিক মানের হাইড্রলিক সিস্টেম জাহাজটিতে বিদ্যমান রয়েছে।

২.৩.২ বঙ্গোপসাগরে আরভি মীন সন্ধানী পরিচালিত জরিপ কার্যক্রম

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের মজুদ (Standing Stock) নিরুপন, সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণ মাত্রা (Maximum Sustainable Yeild) নির্ণয়, সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতির তালিকা প্রণয়ন, ওশেনাগ্রাফিক গবেষণা ও নতুন মৎস্য ও চিংড়ী আহরণ ক্ষেত্র নির্ণয়ই মূলতঃ গবেষণা ও জরিপ জাহাজ আরভি মীন সন্ধানী'র অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। আর এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সায়েন্স টীম সমগ্র মৎস্য সম্পদ জরিপ কার্যক্রমকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছে।

ক. তলদেশীয় মৎস্য সম্পদ জরিপ (Demersal Survey)

খ. চিংড়ী সম্পদ জরিপ (Shrimp Survey), এবং

গ. উপরিস্তরীয় মৎস্য সম্পদ জরিপ (Pelagic Survey)

সাধারণত যেকোন জরিপের জন্য প্রাথমিকভাবে অত্যাবশ্যকীয় হল সার্ভে ডিজাইন (জরিপ নকশা বা পরিকল্পনা) প্রণয়ন করা। সামাগ্রিকভাবে এ ডিজাইন জরিপের জন্য সময়, এলাকা, পদ্ধতি, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ধরণ, জনবলসহ সার্ভে সংক্রান্ত সকল বিষয়াদি অন্তর্ভূক্ত থাকে। সার্ভে ডিজাইনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ হল- সার্ভে ম্যাপ, যেটি ভৌগলিকভাবে সার্ভে এরিয়া ও সার্ভে স্টেশন চিহ্নিত করে। বঙ্গোপসাগরে তলদেশীয় মৎস্য সম্পদ জরিপের ক্ষেত্রে সার্ভে ম্যাপ তৈরীর সময় গভীরতা ভিত্তিক ৪ টি জোন (Depth Zone: Inshore: ১০-৪০m, Midshore: ৪০-৮০ m, Offshore: ৮০-১০০ m and Deep Offshore: ১০০-২০০m depth)ও ৩ টি গ্রাউন্ডে (Swatch, Middle and South) সমগ্র সার্ভে এলাকাকে ভাগ করা হয়েছে। অপরপক্ষে চিংড়ি সম্পদ জরিপের ক্ষেত্রে গভীরতা ভিত্তিক ৩টি জোন (Inshore: ১০-৪০m, Midshore: ৪০-৮০m and Offshore: ৮০-১০০স) ও ৩ টি গ্রাউন্ডে (Swatch, Middle and South) সার্ভে এলাকাকে ভাগ করা হয়।

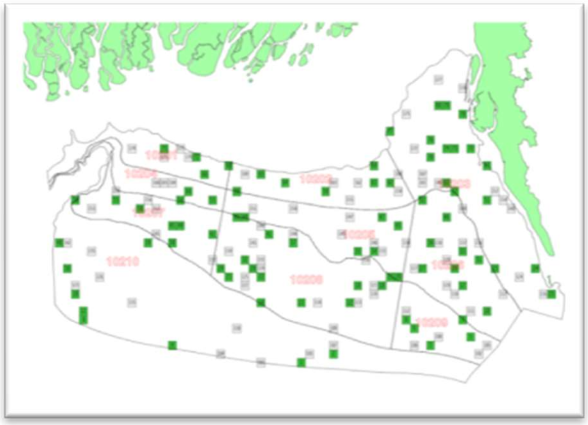

২০২০-২১ খ্রি. সালে আরভি মীন সন্ধানীর জন্য প্রস্তাবিু ডিমার্সাল সার্ভে ম্যাপ

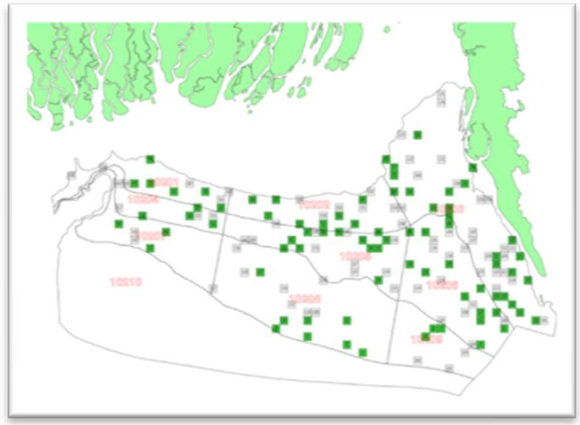

২০২০-২১ খ্রি. সালে আরভি মীন সন্ধানীর জন্য প্রস্তাবিু শ্রিম্প সার্ভে ম্যাপ

পেলাজিক সার্ভের ক্ষেত্রেও ১০-২০০ মি. গভীরতা অঞ্চলকে অন্তর্ভূক্ত করে নির্দিষ্ট দুরুত্ব বজায় রেখে সরলরৈখিক রেখা ভিত্তিক ম্যাপ অংকন করে সার্ভে অপারেশন শুরু হয়েছে। ডিমার্সাল ও শ্রিম্প সার্ভের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট Sampling Station ও Trawling খুবই গুরুত্বপূর্ণ হলেও পেলাজিক সার্ভের ক্ষেত্রে Fish School Sighting কে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

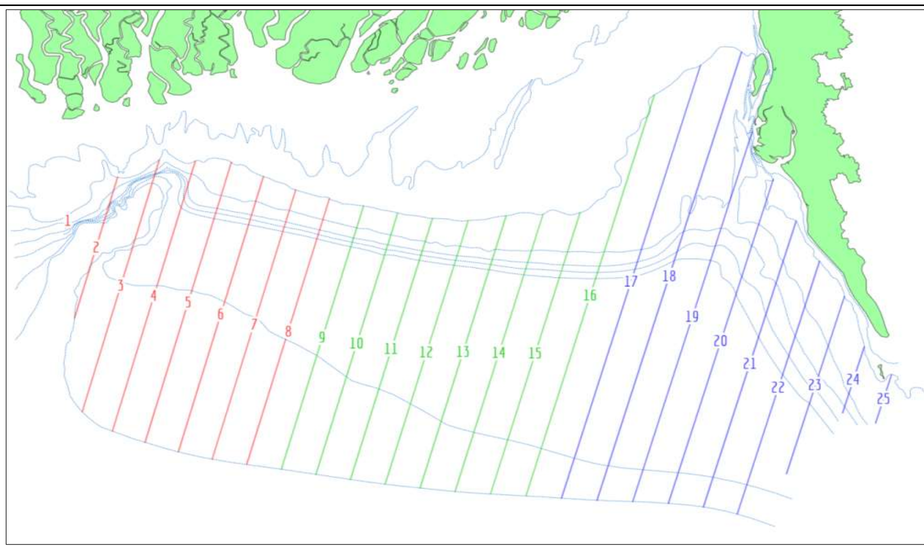

২০২০-২১ খ্রি. সালে আরভি মীন সন্ধানীর জন্য প্রস্তাবিু পেলাজিক সার্ভে ম্যাপ

২.৩.৩ আর ভি মীন সন্ধানী জাহাজে গবেষণা কার্যক্রমের পর্যায় ক্রমিক ধাপ

বিজ্ঞানী ও ক্রুদের সম্মিলিত ক্রুজ আদেশ প্রণয়ন

⇓

জরিপের উদ্দেশ্যে মীন সন্ধানীর যাত্রা

⇓

নির্দিষ্ট স্টেশনে পৌঁছে জাল প্রস্তুতকরণ ও অপারেশন

⇓

নির্দিষ্ট সময় পরে জাল উত্তোলন

⇓

আহরিত মৎস্য ও অন্যান্য প্রজাতির প্রাথমিক বাছাইকরণ

⇓

অভিজ্ঞ টেক্সোনমিস্ট দ্বারা প্রজাতি ভিত্তিক বাছাইকরণ

⇓

বাছাইকৃত প্রজাতি সমূহের দৈর্ঘ্য ও ওজনের তথ্য লিপিবদ্ধকরণ

⇓

সফ্টওয়্যারে সংগৃহীত তথ্য সংরক্ষণ

⇓

সংরক্ষিত তথ্য বিশ্লেষণ

⇓

মৎস্য সম্পদের মজুদ ও অন্যান্য তথ্য সম্পর্কে ধারনালাভ

২.৩.৪ আর ভি মীন সন্ধানী জাহাজের জরিপ কাজের ফলাফল (জুন ২০২১ পর্যন্ত)

উদ্বোধনের পর থেকে আর ভি মীন সন্ধানী জাহাজ এখন পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকারের ৩১ টি ক্রুজ সফলভাবে পরিচালনা করেছে। এ পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের বিভিন্ন অঞ্চল ও গভীরতায় সর্বমোট প্রাপ্ত ৪৫৭ প্রজাতির সামুদ্রিক প্রাণিকূলের মধ্যে ৩৯৪ প্রজাতির মাছ, ৪৯ প্রজাতির ক্রাস্টাসিয়ান ও ১৪ প্রজাতির সেপালোপোড সনাক্ত করে তাদের জৈব-তাত্ত্বিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। জরিপ জাহাজ কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

জরিপ বর্ষ জরিপের ধরণ	ক্রুজ সংখ্যা (২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত)	ক্রুজ সংখ্যা (২০১৯-২০)	ক্রুজ সংখ্যা (২০২০-২১)	উপ-মোট: (২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত)
চিংড়ি সার্ভে	১০	১	৫	১৬
ডিমার্সাল সার্ভে	১০	০	০	১০
পেলাজিক সার্ভে	৪	০	০	৪
বিশেষ সার্ভে	০	০	১	১
উপ-মোট	২৪	১	৬	সর্বমোট: ৩১

এ গবেষণা জাহাজ দ্বারা আহরিত ২০১৬-১৭ বর্ষের আংশিক ও তৎপরবর্তী ধারাবাহিক দুটি জরিপ বর্ষের (২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯) তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষনের মাধ্যমে ২০১৯ সালে Marine Fisheries Survey Reports and Stock Assessment 2019 নামে একটি জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপে দেখা যায়, অতীতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল খাতে ধৃত মাছের প্রতিবেদনের অপূর্ণতা উপাত্ত বিশ্লেষণে জটিলতা সৃষ্টি করেছে, যা ২০১১ সালের পরে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এছাড়া এই সমস্যার কারণে ২০১১ সাল থেকে ধৃত মাছের পরিমাণে হঠাৎ বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে।

বিভিন্ন প্রকার মাছের মজুদ ও আহরণের হার ভিন্ন ভিন্ন প্রবণতা প্রদর্শন করেছে। বৃহদাকার ও অধিক মূল্যবান মাছের গ্রুপ সমূহ প্রায় নিঃশেষিত হওয়ার পথে। উপজাত হিসেবে পাওয়া যায় এমন কিছু মাছের ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যতিক্রমী প্রবণতা লক্ষণীয়। ছোট আকারের পেলাজিক মাছ, বিশেষত সার্ডিন বা চাপিলার আহরণ বেড়েছে অনেক বেশি।

বিশ্লেষণে আরও দেখা যায়, বিগণ ৩০ বছর ধরে সকল প্রকার চিংড়ির মজুদ ধারাবাহিকভাবে ক্রমহ্রাসমান প্রবণতা প্রদর্শন করছে এবং বুর্মানে এদের মজুদ কিছুটা নিঃশেষিত পর্যায়ে আছে। অন্যদিকে, মূল্যবান চিংড়ির আহরণ কমে গেলেও কম মূল্যবান চিংড়িগুলোর আহরণ বৃদ্ধি পরিস্থিতিকে কিছুটা সামাল দিয়েছে।

মোদ্দাকথা, সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ইতোমধ্যে মারাত্নকভাবে অতি আহরিত হয়েছে এবং হচ্ছে। ফলে দামী ও চাহিদা সম্পন্ন মাছের প্রজাতিগুলোর মজুদ অস্বাভাবিক ভাবে হ্রাস পেয়েছে। সবচেয়ে বেশি আহরিত প্রজাতিগুলোর মধ্যে আছে- বাগদা চিংড়ি, লাক্ষা মাছ ও বড় আকারের পোয়া মাছ।

২.৩.৫ আর ভি মীন সন্ধানী জাহাজে মৎস্য সম্পদের মজুদ বহির্ভূত অন্যান্য গবেষণা কার্যক্রম

১) সাগরের বিভিন্ন অঞ্চল ও গভীরতায় ওশানোগ্রাফিক তথ্যসংগ্রহ (লবনাক্ততা, তাপমাত্রা)।

২) সাগর তলদেশের মাটি সংগ্রহ এবং বেন্থোজ সম্পর্কে ধারণালাভ।

৩) বিভিন্ন অঞ্চলে সাগরের উপরিস্তরের পানির প্লাংকটনের ঘনত্ব এবং প্রজাতি বৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারণালাভ।

৪) নুন মৎস্য ও অন্যান্য প্রাণিকূল সনাক্তকরণ।

বঙ্গোপসাগরের জরিপ কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া। সাধারণত মৎস্য সম্পদ জরিপের ধারাবাহিক ডাটার বিশ্লেষণ থেকে ওই জলসীমায় বসবাসকারী বিভিন্ন প্রজাতির জলজ প্রাণীর Standing Stock ও স্ব-স্ব প্রজাতির Population Parameter সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে দীর্ঘ দিন ধরে বন্ধ থাকার পর পূণরায় মাত্র দুটি ধারাবাহিক বছরের ডাটা সংগ্রহ করা হয়েছে আর ভি মীন সন্ধানীর মাধ্যমে। ফলে জরিপের একটি পূর্ণাঙ্গ ও গ্রহণযোগ্য ফলাফল পেতে ধারাবাহিকভাবে অনেক বছরের তথ্য-উপাত্ত প্রয়োজন। এজন্য জরিপ কাজের ধারাবাহিকতা যাতে বিঘ্নিত না হয় সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও মৎস্য অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক নজরদারি অত্যন্ত জরুরী।

২.৪ বুর্মানে অবুরণ কেন্দ্রভিত্তিক উপকূলীয় মৎস্য সম্পদ জরিপ

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সর্বোচ্চ সহনশীল মৎস্য আহরণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মৎস্য অবুরণ কেন্দ্র ভিত্তিক সঠিক তথ্য সংগ্রহের কোন বিকল্প নেই। বঙ্গোপসাগরের বিশাল সমুদ্রসীমায় যে মূল্যবান মৎস্য সম্পদ আছে তা নবায়নযোগ্য হওয়ায় এবং সুষ্ঠুভাবে বিজ্ঞানভিত্তিক টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্যবহার করলে তা একটি নির্দিষ্ট সহনশীল মাত্রায় অনন্তকাল ধরে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, অবুরণকেন্দ্র ভিত্তিক মৎস্য জরিপ ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমরা এখনও অনেক পিছিয়ে আছি। তবে, আশার কথা হলো বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তর বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে নতুন করে বড় পরিসরে দেশের উপকূল জুড়ে অবতরণ কেন্দ্রভিত্তিক জরিপের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

২.৪.১ অবতরণ কেন্দ্রভিত্তিক জরিপের প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য

সামুদ্রিক মাছের প্রায় শতকরা ৮৪ ভাগই আহরিত যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক নৌযানের মাধ্যমে। বাংলাদেশের সমগ্র উপকূলে কম-বেশী ২৩৫টি মৎস্য অবুরণ কেন্দ্রে প্রায় ৬৮,০০০ টি যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক নৌযান তাদের আহরিত মৎস্যসম্পদ ল্যান্ডিং করে থাকে। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের মজুদ নির্ণয় এবং সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অবতরণ কেন্দ্র ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম অপরিহার্য। তাছাড়াও ব্রিডিং ও নার্সারী গ্রাউন্ড নিরূপনে উপকূলীয় অগভীর পানিতে মৎস্যসম্পদ আহরণে নিয়োজিত নৌযানসমুহের অবতরণ কেন্দ্র ভিত্তিক আহরণ তথ্যও অবশ্যম্ভাবী। মেরিন রিজার্ভ, মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া কিংবা মেরিন রিফুজিয়া বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজন। কারণ, বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহকারীগণ উপকূলীয় ৩৫টি বা তার অধিক সংখ্যক অবতরণ কেন্দ্র থেকে একই প্রক্রিয়ায় তথ্য সংগ্রহ না করলে, তথ্য সংগ্রহের সময় ব্যক্তি ভিত্তিক ভুল (Subjective error) বেশী হতে পারে। মাছের মজুদ সঠিকভাবে নিরূপণের জন্য তথ্য সংগ্রহের স্বার্থে সকলের জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনা হিসেবে আদর্শ কার্যপ্রণালী বা এসওপি থাকা অত্যন্ত জরুরি।

মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ও প্রাপ্ত তথ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতিসমুহের মজুদ নিরূপন কার্যক্রম যথাসম্ভব নির্ভুল করতে নতুন ভাবে পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে মৎস্য অধিদপ্তর। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ বিধায় নিয়মিত ও নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে ল্যান্ডবেইজ্ড জরিপের মাধ্যমে সম্পদের প্রাচুর্যতা, প্রজাতির গতি প্রকৃতি (Trend) ও বিস্তৃতির হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা। বঙ্গোপসাগরের একান্ত অর্থনৈতিক এলাকার মৎস্য ও চিংড়ি সম্পদের অবস্থা, বিস্তৃতি (Distribution), প্রাচুর্যতাসহ

(Abundance) যান্ত্রিক-অযান্ত্রিক নৌযান দ্বারা মৎস্য আহরণ কার্যক্রমের সঠিক ব্যবস্তাপনার মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ও ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠু নীতিমালা নির্ধারণকল্পে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন তৈরী ও সুপারিশমালা প্রনয়ণ করা।

২.৪.২ সমুদ্র উপকূলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র

কক্সবাজার জেলার টেকনাফ নদীর মোহনা থেকে সাতক্ষীরা জেলার রায় মঙ্গল নদীর মোহনা পর্যন্ত সমগ্র উপকূলবর্তী এলাকা জুড়ে মৎস্য অবুরণ কেন্দ্র অবস্থিত যেখানে যান্ত্রিক-অযান্ত্রিক নৌকা দ্বারা মৎস্য আহরিত হয়। সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল, মোহনা এলাকা, দীপাঞ্চল এবং মিঠাপানির জলাশয়ের যে অংশ পর্যন্ত জোয়ার-ভাটার প্রভাব সক্রিয় থাকে তাকে উপকুলীয় অঞ্চলভুক্ত এলাকা বলে। সুনির্দিষ্টভাবে উপকুলকে সংজ্ঞায়িত করা বেশ দূরূহ হলেও ইহা স্পষ্ট যে, উপকুলীয় এলাকার পানি অতি লবনাক্ত নয় আবার স্বাদু পানির ন্যায় লবনাক্তহীনও নয়। সাধারনুঃ উপকূলীয় গ্রাম সংলগ্ন নদী বা সাগর কিনারায় যেখানে নৌকা ভিড়ানোর সুযোগ রয়েছে সেখানেই মৎস্য অবুরণ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। উপকুলর্বুী অঞ্চলে গড়ে উঠেছে এক বিশেষ শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের মানুষের আবাসস্থল, যারা জেলে সম্প্রদায় নামে পরিচিত এবং এদের জীবন ও জীবিকা দুটোই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এ উপকুলের সাথে। টেকনাফ নদীর মোহনা থেকে রায় মঙ্গল নদীর মোহনা পর্যন্ত সমগ্র উপকূল জুড়ে সারা বছর মৎস্য আহরণ করে এবং মাছ ল্যান্ডিং করে থাকে ছোট-বড় ২১০টি মৎস্য অবুরণ কেন্দ্রে।

২.৪.৩ মৎস্য জরিপের জন্য নির্বাচিত মৎস্য অবুরণ কেন্দ্র

অবুরণকেন্দ্র ভিত্তিক মৎস্য আহরণ তথ্য সংগ্রহ কাজের জন্য বাংলাদেশের ১৪ টি উপকূলীয় জেলা থেকে ৬০টি নির্বাচিত তথ্য সংগ্রহকেন্দ্র (স্যাম্পলিং স্টেশন) এর অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং একযোগে তথ্য সংগ্রহ কর্মসূচি মোতাবেক তথ্য সংগ্রহ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মৎস্য অবুরণ কেন্দ্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রথমে বাংলাদেশের তালিকাভুক্ত ২১০ টি উপকূলীয় অবুরণ কেন্দ্র কে বড়, মাঝারি ও ছোট ক্যাটেগরিতে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেক জেলা থেকেই প্রতি ক্যাটেগরি থেকে মৎস্য অবুরণ কেন্দ্র নির্বাচন করা হয়েছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিকটবর্তী অন্যান্য যেসকল কেন্দ্রকে সহযোগী হিসেবে রাখা হয়েছে, সেখান থেকেও যুদুর সম্ভব আহরণ ও প্রচেষ্টা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

সারণি: জেলাভিত্তিক নির্বাচিত মৎস্য অবুরণ কেন্দ্রের সংখ্যা

ক্রম.	জেলা	অবুরণ কেন্দ্রের সংখ্যা	বড়	মাঝারি	ছোট
১	কক্সবাজার	১০	৫	৩	২
২	চট্টগ্রাম	৭	৩	২	২
৩	নোয়াখালী	৪	২	১	১
৪	লক্ষীপুর	২	-	১	১
৫	ফেনী	১	-	১	-
৬	খুলনা	৪	২	১	১
৭	বাগেরহাট	৫	১	৩	১
৮	সাতক্ষীরা	৪	-	২	২
৯	বরিশাল	৪	২	১	১
১০	পটুয়াখালী	৫	২	২	১
১১	ভোলা	৫	২	২	১
১২	পিরোজপুর	২	-	১	১
১৩	বরগুনা	৫	২	১	২
১৪	ঝালকাঠি	২	-	-	২
	মোট	৬০	২১	২১	১৮

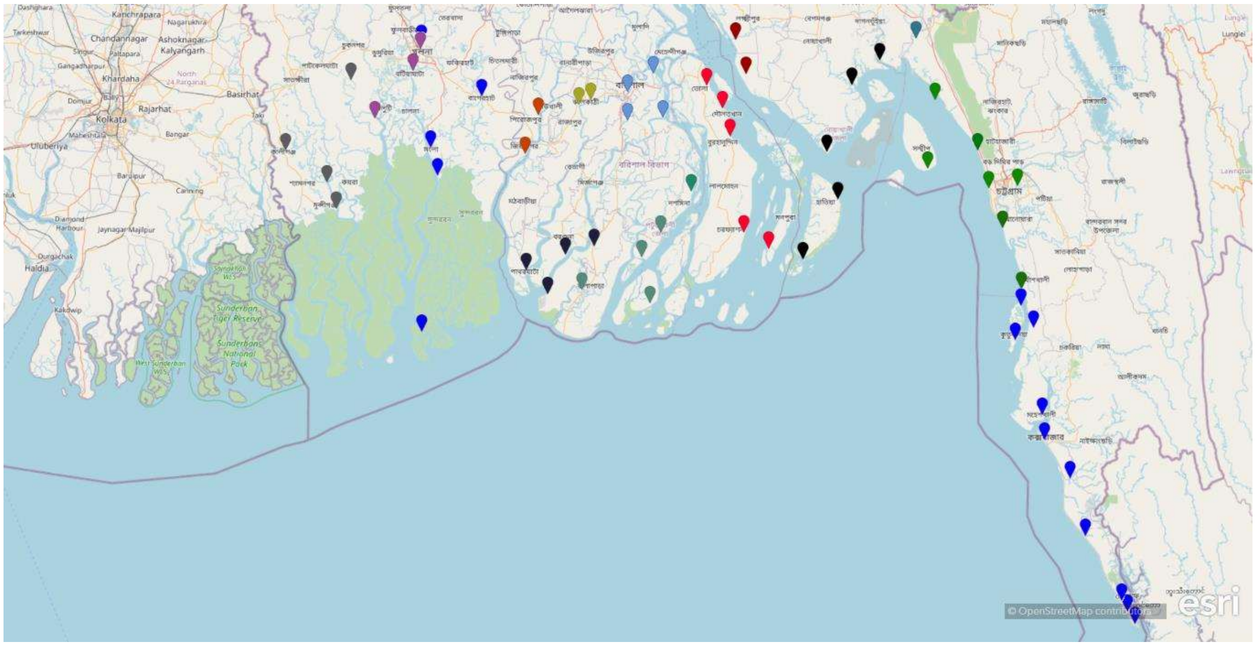

	কক্সবাজার (১০)		পটুয়াখালী (৫)
	চট্টগ্রাম (৭)		বরগুনা (৫)
	ফেনী (১)		ঝালকাঠি (২)
	নোয়াখালী (৪)		পিরোজপুর (২)
	লক্ষীপুর (২)		বাগেরহাট (৫)
	ভোলা (৫)		খুলনা (৪)
	বরিশাল (৪)		সাতক্ষীরা (৪)

চিত্র ১. নির্বাচিত ৬০ টি মৎস্য অবুরণ কেন্দ্রের অবস্থানের মানচিত্র

২.৪.৪ নির্ধারিত তথ্য সংগ্রহ কর্মসূচী:

প্রতি মাসে সকল নির্বাচিত নমুনা সংগ্রহ কেন্দ্রের জন্য একই দিনগুলিতে নমুনা সংগ্রহ করার লক্ষ্যে সর্বমোট ০৪ দিনের তথ্য সংগ্রহ কর্মসূচিপ্রণয়ন করা হয় এবং এই ০৪ দিন নিম্নরুপ হবে:

- পূর্ণিমার 'জোঁ' এর ০১ দিন
- ১ম 'ডালা' এর যেকোন ০১ দিন
- আমবশ্যার 'জোঁ' এর ০১ দিন
- ২য় 'ডালা' এর যেকোন ০১ দিন

সর্বমোট প্রতি মাসে ০৪ দিন

এখানে 'জোঁ' বলতে অমাবশ্যা ও পূর্ণিমার সময়ে ৩-৭ দিন যখন জোয়ার-ভাটার প্রভাব সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকে তাহাকে বুঝায়। আর বাকী দিনগুলোকে 'ডালা' বলে। এই 'জোঁ' এর সময়ে সকল প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে মাছ আহরণের পরিমাণ সব থেকে বেশী হয়। তাই, তথ্য সংগ্রহ কর্মসূচি প্রণয়ন করার সময় 'জোঁ' এবং 'ডালা' উভয়ই বিবেচনা করা উচিত।

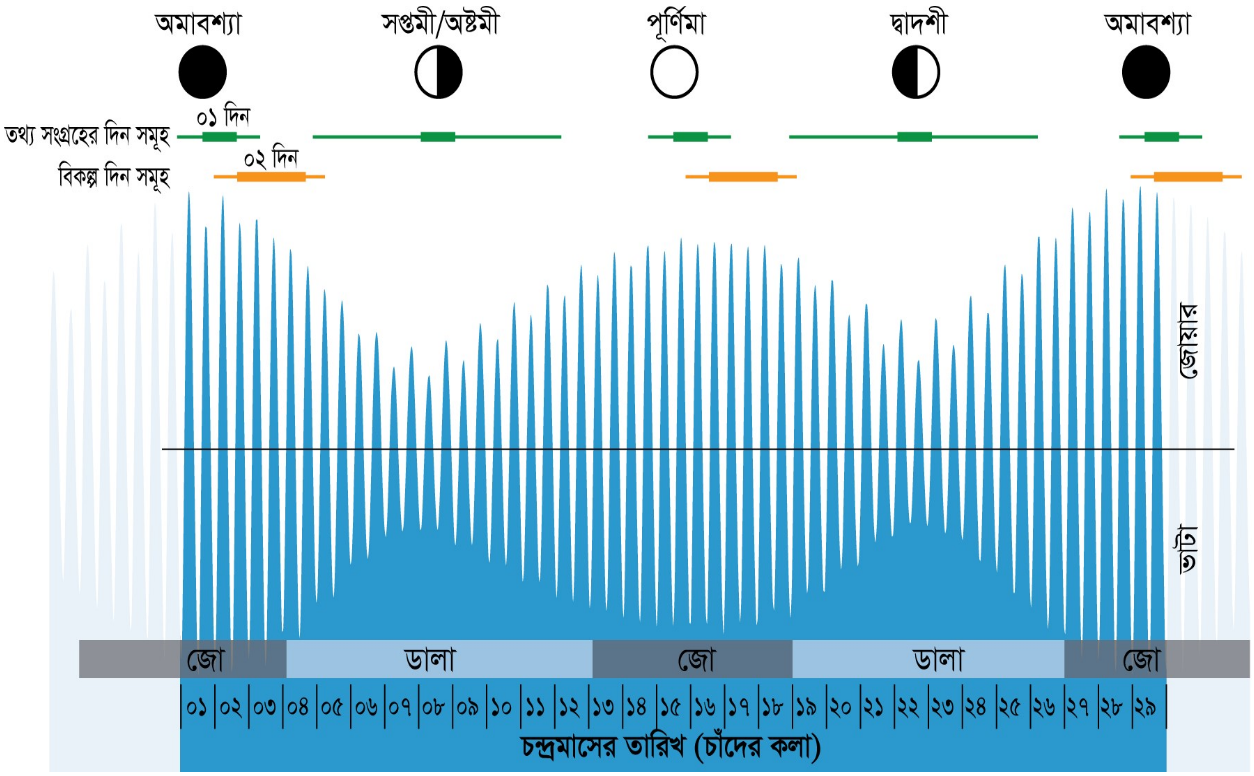

চিত্র-২. চন্দ্রমাসের বিভিন্ন দিনে জোয়ার-ভাটার তুলনামূলক পরিমাণের মাধ্যমে 'জো' ও 'ডালা' প্রদর্শন।

২.৪.৫ অবুরণকৃত বা আহরিত মাছের দৈর্ঘ্য, ওজন ও পরিমাণ নিরূপন

বেহুন্দি জাল (Set Bagnet) এ আহরিত মাছের প্রজাতি সনাক্তকরণ, দৈর্ঘ্য, ওজন ও উপস্থিতির হার নির্ণয় এবং ছোট ভাসান জাল (SMD- Small Mesh Drift gill net), বড় ভাসান জাল (LMD- Large Mesh Drift gill net), হাঙ্গর জাল (Shark net) ও রগ জাল (Rog jal) এ আহরিত মাছের নমুনা সংগ্রহ প্রজাতি সনাক্তকরণ, দৈর্ঘ্য, ওজন ও বিশ্লেষণ বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রপাতি, নমুনা সংগ্রহের ছক এবং পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। যা চুড়ান্তভাবে বিশ্লেষণ করে সর্বমোট আহরিত মাছের পরিমান নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়।

২.৪.৬ তথ্য সংগ্রহ কাজের আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি

মাছের মজুদ নিরূপণের লক্ষ্যে অবুরণ কেন্দ্রভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের জন্যে খুব কম যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজের জন্য যে সকল যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় সেগুলির তালিকা নিচের সারণিতে উপস্থাপন করা হলো:

সারণি-২ মাছের মজুদ নিরূপণের লক্ষ্যে অবুরণ কেন্দ্র ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির তালিকা

ক্রম.	ব্যবহারের স্থান	যন্ত্রপাতি/ উপকরণের নাম	যন্ত্রপাতির কাজ বা ব্যবহার
০১	অবুরণ কেন্দ্র	স্কেল/ফিতা/বোর্ড/	মাছের দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য
০২		ডিজিটাল ব্যালান্স (বড়)	মাছের ওজন পরিমাপের জন্য
০৩		সেকি ডিস্ক	মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র থেকে সরাসরি তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে পানির গুনাগুন লিপিবদ্ধ করার জন্য
০৪		রিফ্রাক্টোমিটার	
০৫		থার্মোমিটার	
০৬		জিপিএস / ক্যামেরা	অবুরণ কেন্দ্র, তথ্য সংগ্রহ কেন্দ্র বা আহরণ স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান অর্থাৎ অক্ষাংশ (Latitude) ও দ্রাঘিমাংশ (Longitude) নিরূপণের জন্য
০৭	অবুরণ কেন্দ্র ও ল্যাবরেটরি	ক্যামেরা (ডিজিটাল)	প্রজাতিসমূহের স্থিরচিত্র সংরক্ষণের জন্য
০৮		স্লাইড ক্যালিপার্স	নমুনার মাপ গ্রহণের জন্য
০৯		ডিজিটাল ব্যালান্স (ছোট)	নমুনার ওজন গ্রহণের জন্য
১০		ম্যাগনিফাইং গ্লাস	নমুনার সনাক্তকরণের জন্য
১১		মাইক্রোস্কোপ	নমুনার সুক্ষ সনাক্তকরণের জন্য
১২		বায়োলজিক্যাল ডিসেকটিং বক্স	নমুনা ব্যবচ্ছেদের জন্য
১৩		প্রিজারভেটিভ (কন্টেনারসহ)	নমুনা সংরক্ষণের জন্য

২.৪.৭ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ও পরিমাণ

তথ্য সংগ্রহের সময় লক্ষ্য রাখা উচিৎ যেন যুদূর সম্ভব নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ পরিহার করে নিরপেক্ষ বা কার্যপোযোগী নমুনা সংগ্রহ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। এই প্রক্রিয়ার মূল কথা হলো, নমুনা সংগ্রহ বা তথ্য সংগ্রহের সময় উপস্থিত একই ধরনের সকল নৌযান বা মাছ নমুনার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সমান সুযোগ পায়। ইচ্ছাকৃতভাবে কোন নৌযান বা মাছ নমুনার আওতার বাইরে রাখা যাবে না। অন্য কথায়, উপস্থিত একই ধরনের সকল নৌযান বা মাছ নমুনা সংগ্রহের পূর্বে বাছাই করে নেওয়া যাবে না। অ-বাছাইকৃতভাবে নমুনা ও তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। তবে, কোন ধরনের বা 'গ্রুপ' থেকে নমুনা বা তথ্য সংগ্রহ করা হবে তাহা পূর্বেই নির্ধারণ বা বাছাই করে নিতে হবে। যেমন- 'যান্ত্রিক নৌযান' একটি 'গ্রুপ' এবং 'অ-যান্ত্রিক নৌযান', 'বেহুন্দি জাল', 'পোয়া জাল', 'হুন্দ্রা জাল', ইণ্যাদি, ভিন্ন ভিন্ন 'গ্রুপ' এর অন্তর্ভুক্ত। তাই, তথ্য সংগ্রহের সময়, কোন 'গ্রুপ' থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হবে সেটি পূর্বনির্ধারিত হতে হবে, কিন্তু ঐ নির্বাচিত 'গ্রুপ' ভূক্ত উপস্থিত সকল নৌযান বা মৎস্য নমুনার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সমান সুযোগ যেন পায় তার জন্য নিরপেক্ষ নমুনা সংগ্রহ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা উচিৎ হবে।

নির্বাচিত 'গ্রুপ' থেকে কী পরিমাণ নমুনা ও তথ্য সংগ্রহ করতে হবে তা মূলতঃ নমুনা ও তথ্য সংগ্রহের সুযোগ ও সামর্থের উপর নির্ভর করে। এখানে, সুযোগ বলতে কী পরিমাণ বোট বা মাছ উপস্থিত আছে যা থেকে নমুনা ও তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব তাকে বুঝায়। আর, সামর্থ বলতে কী পরিমাণ বোট থেকে ঐ নির্দিষ্ট সময়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য জনবল আছে বা কী পরিমাণ মাছ নমুনা হিসেবে সংগ্রহ করার সুযোগ আছে তাকে বুঝায়। সাধারণভাবে, নমুনার আকার বা তথ্য সংগ্রহের পরিমাণ যু বেশি হবে, সংগৃহীত তথ্যে ভুলের পরিমাণ তত কম হবে, ফলে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

২.৪.৮ কার্যপ্রণালী

নির্দিষ্ট নমুনায়ন কর্মসূচি অনুসারে সকল তথ্য সংগ্রহ কেন্দ্র থেকে একযোগে নমুনা বা তথ্য সংগ্রহ কাজ পরিচালনা করা সমীচীন। যাতে এক তথ্য সংগ্রহ কেন্দ্রের মাছ বা নৌযান অন্য কোথাও আবার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আশংকা কমে। এখানে নমুনায়ন কর্মসূচী অনুসারে তথ্য সংগ্রহ কেন্দ্র থেকে তথ্য সংগ্রহ ছাড়াও সকল তথ্য সংগ্রহ কেন্দ্রের জন্য আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসরণীয় বিষয় হলো উপযুক্ত নমুনা সংগ্রহের সময় নির্ধারণ। এই নমুনায়নের সময় বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ কেন্দ্রের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। তাই, নিজ নিজ তথ্য সংগ্রহ কেন্দ্র উপযুক্ত সময় নির্ধারণপূর্বক নমুনায়ন পরিচালনা বা তথ্য সংগ্রহ করা বাঞ্ছনীয়। এখন বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন কার্যপ্রণালী ধারাবাহিকভাবে নিচের অধ্যায় গুলিতে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হলো।

- ছোট-বড় বেহুন্দি জাল দ্বারা আহরিত উপকুলীয় এলাকায় মৎস্য অবুরণ কেন্দ্র থেকে জোয়ার-ভাটার সময় অনুযায়ী প্রতি মাসে নির্ধারিত ০৪ দিন করে মাছের নমুনা (অবাছাইকৃত) সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য দপ্তর কর্তৃক সংগ্রহ করা হবে। উক্ত নমুনা বিশ্লেষণ পূর্বক আহরিত বিভিন্ন প্রজাতিসমুহ সনাক্ত এবং মাছের দৈর্ঘ্য ও ওজন নির্ণয় করা হয়। উক্ত বিশ্লেষণ বা সনাক্তকরণ ফলাফল মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন আকারে প্রণয়ন করা হয়। সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট এর কর্মকর্তাবৃন্দের পক্ষ থেকে প্রত্যেক জেলায় বা উপজেলায় তথ্য সংগ্রহ এবং প্রতিবেদন প্রণয়নে প্রত্যক্ষ সহযোগিণা করা হয়।
- উপকুলীয় এলাকায় সাধারণত গভীর সাগরে ভাসান জাল দ্বারা ইলিশ মাছ আহরণ করা হয়ে থাকে। আহরিত ইলিশ মাছের দৈর্ঘ্য, গড় দৈর্ঘ্য, ওজন ও গড় ওজন এবং মোট আহরণ পরিমান নির্ণয় করা হবে যা মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হবে।
- চট্টগ্রামস্থ ফিসারী ঘাট, কক্সবাজারস্থ বি.এফ.ডি.সি ঘাট এবং পটুয়াখালীস্থ মহীপুর ঘাট হতে হাঙ্গর জাতীয় মাছের (হাঙ্গর ও হাউস) মাসে ০৪ দিন তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ প্রজাতি সনাক্ত, প্রজাতি সংখ্যা ও অবুরনের পরিমান নির্ণয় করা হবে। উক্ত তথ্য উপাত্ত নিয়মি মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রতিফলন ঘটিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হবে।

২.৫ বঙ্গোপসাগরে বাণিজ্যিক মৎস্য আহরণেরণের ক্রমবিকাশ ও বর্তমান অবস্থা

প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশের উপকূলীয় ও অগভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে প্রধানুঃ কাঠের তৈরি নৌযান ব্যবহার হয়ে আসছে। একসময় অযান্ত্রিক নৌকায় পাল ও দাঁড় ব্যবহার করে নৌকা চালিয়ে মাছ ধরা হতো। পরবর্তীতে সত্তরের দশকে ডেনমার্কের সহায়তায় ডেনিশ নৌযানের আদলে কাঠের তৈরি ইঞ্জিনচালিত মৎস্য নৌযান ব্যবহার শুরু হলে তা ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠে। এসব মৎস্য নৌযানে সাধারণতঃ ৩২ অশ্বশক্তি ক্ষমুাসম্পন্ন ইয়ানমার ইঞ্জিন ব্যবহার করে ইলিশ ধরার ফাঁস জাল দিয়ে মাছ ধরা হতো। পরবর্তীতে অপেক্ষাকৃত কম দামের কম অশ্বশক্তি ক্ষমুাসম্পন্ন চায়না ইঞ্জিনের আমদানী শুরু হলে রাতারাতি দাঁড়টানা নৌকাও যান্ত্রিক নৌযানে রূপান্তরিত হতে থাকে।

স্বাধীনুা পূর্ব বিভিন্ন জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে বাংলাদেশের একান্ত অর্থনৈতিক এলাকায় মৎস্য ও চিংড়ির সন্তোষজনক মজুত প্রতীয়মান হওয়ায় স্বাধীনুার অব্যবহিত পর রাশিয়া কর্তৃক প্রদত্ত ১০টি ট্রলারের মাধ্যমে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি) বানিজ্যিকভাবে মৎস্য আহরণ শুরু করে। এরপর ১৯৭৬-৮৬ সময়কালে দেশীয় ব্যক্তিমালিকানায় অথবা যৌথ উদ্যেগে বিশেষ করে থাইল্যান্ড এর অংশগ্রহনের মাধ্যমে আয় থেকে দায় পরিশোধ পদ্ধতিতে (Pay As You Earn) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে ১১৪ টি ট্রলার মৎস্য আহরণে নিয়োজিত হয়। পাশাপাশি সরকার বানিজ্যিক ট্রলার ফিশারিকে “Open Industry” হিসেবে ঘোষণা করে। এ সুযোগে বহু সংখ্যক অননুমোদিত ট্রলার বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণে নিয়োজিত হয়ে পড়ে। ফলে মৎস্য সম্পদের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হয়।

২.৫.১ বাণিজ্যিক মৎস্য আহরণ

র্বুমানে আমাদের দেশে সামুদ্রিক মৎস্য এলাকায় অনুমোদিত ৩৭টি চিংড়ি ট্রলার ও ২২৫টি মৎস্য ট্রলারের মধ্যে প্রায় ২৩৪ টি ট্রলার সারা বছর ট্রল জাল দ্বারা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কুধুমাত্র তলদেশীয় মাছ, সেমি-পেলাজিক মাছ ও চিংড়ি আহরণ করছে। এ সকল ট্রলার দ্বারা যে পরিমান মাছ ও চিংড়ি ধরা হচ্ছে তা সমুদ্রে মোট আহরণের মাত্র ১৩ শতাংশ। উল্লেখ্য, সমুদ্রের উপরিতলের মাছ যেমন- টুনা ও টুনা জাতীয় বড় আকারের মৎস্য আহরণের জন্য অদ্যাবধি কোন শিল্প গড়ে উঠেনি। ফলে অল্প কিছূ টুনা ও টুনা জাতীয় বড় আকারের মাছ বাই ক্যাচ হিসেবে পাওয়া গেলেও এ ধরণের অধিকাংশ মাছই অনাহরিত থেকে যাচ্ছে।

২.৫.১.১ চিংড়ি ট্রলার

দেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে স্থায়িত্বশীল চিংড়ি আহরণের জন্য ৪৬ টি চিংড়ি ট্রলার পরিচালনার জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়। কিন্তু ট্রলারের জীবনকাল শেষে প্রতিস্থাপনের প্রয়োজনে মৎস্য ট্রলার দিয়ে প্রতিস্থাপনের সংস্থান রাখা হয় এবং এর বিপরীতে চিংড়ি ট্রলার আমদানী বা দেশে নির্মান নিষিদ্ধ করা হয়। বর্তমান্ট্রলার বহরে যুক্ত চিংড়ি ট্রলারের দৈর্ঘ্য ২০-৩০ মিটার, অশ্বশক্তি ৩৫০-৮৫৫ বিএচপি, জালের কড এন্ড (শেষ প্রান্ত) এর ফাঁস ৪৫ মিলিমিটার এবং হেডরোপ দৈর্ঘ্য ১৫-৩৫ মিটার।

চিংড়ি ট্রলারের আউট রিগারে জাল সংযুক্ত করে জালের বটম লাইনের সাথে টিকলার চেইন ব্যবহার করে চিংড়ি আহরণ করে। জালে আটকে পড়া কচ্ছপের বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টির জন্য আইনে Turtle Excluder Device (TED) ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বিগণ পাঁচ বছরের আহরণ তথ্য বিশ্লেষণে চিংড়ি ট্রলার প্রতি আহরণ/ দিন (কেজি) (Catch Per Unit Effort-CPUE) হ্রাস-বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে। বিগণ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে আহরিত মোট চিংড়ির মধ্যে বাগদা ৯.১২%, বাদামী ৭১.৯২%, সাদা চিংড়ি ৩.৬৫% এবং অন্যান্য চিংড়ি ১৫.৩১%পাওয়া যায়।

চিংড়ি জালে টিকলার চেইন ব্যবহারের কারনে পানির তলদেশ আন্দোলিত হয় ফলে সামুদ্রিক পরিবেশ ও প্রতিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হয়। এতে প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা কমে যায় ও তলদেশের মাটির উপরিতল সমুলে পরিণত হয়। ফলে তলদেশীয় মৎস্যসম্পদের বাসস্থানের মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়াও ডিমওয়ালা চিংড়ি আহরণ মৌসুমে বিক্ষিপ্তভাবে মা চিংড়ি আহরণের অনুমতি না দিয়ে পর্যায়ক্রমে দক্ষতাসম্পন্ন চিংড়ি ট্রলারকে মা চিংড়ি আহরণের অনুমতি দিলে চিংড়ি সম্পদের মজুত বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

২.৫.১.২ মৎস্য ট্রলার বা ডিমার্সেল ট্রলার

বিনিয়োগ বোর্ড এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মহামান্য হাইকোর্ট এর অনুমোদন প্রাপ্ত হয়ে এক সময় ৭৮ টি মৎস্য, ডিমার্সল বা হোয়াইট ফিস ট্রলার নামে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ছিল। পরবুীতে রূপান্তরের নির্দেশের প্রেক্ষিতে র্বুমানে ৪৬ টি মৎস্য ট্রলার মৎস্য আহরণে নিয়োজিত রয়েছে। মৎস্য ট্রলার গুলোর দৈর্ঘ্য ২৮-৪০ মিটার, জালের কড এন্ড প্রান্তের ফাঁস ৬০মি.মিটার এবং অশ্বশক্তি ৩৫০-১,৪৫০ বিএইচপি।

এই প্রকার ট্রলারে জালের বটম লাইনে ববিন সংযোজিত থাকায় উঁচু-নীচু তলদেশে মৎস্য আহরণ করতে কোন অসুবিধা হয় না। প্রায় প্রতিটি ট্রলারে উন্নত নেভিগেশন সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন, আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন মৎস্য অনুসন্ধান সামগ্রী (যেমন- ইকো-সাউন্ডার, সোনার, নেট রেকর্ডার, ট্রল-আই ইণ্যাদি) সংযোজিত থাকে। সমুদ্র তলদেশের প্রতিবেশ বা ইকোসিস্টেম বিনষ্টসহ মাছের বংশ বৃদ্ধিতে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য শিকল বিনষ্ট, অধিক পরিমানে কিশোর মাছ আহরণের নেতিবাচক প্রভাব থেকে মৎস্যসম্পদকে রক্ষার জন্য পৃথিবীর বহুদেশে বটম ট্রলার নিরুৎসাহিত বা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

২.৫.১.৩ মিডওয়াটার ট্রলার

বটম ট্রলারকে মিডওয়াটার ট্রলারে রূপান্তরিত করায় র্বুমানে সর্বমোট ১২৩ টি মিডওয়াটার ট্রলার মৎস্য আহরণে নিয়োজিত রয়েছে। এ সকল ট্রলারের জালের হেড রোপ ৭০-১১০ মিটার, গ্রাউন্ড রোপ ৭১-১১০ মিটার যা মৎস্য আহরণকালে ৩০ মিটার পর্যন্ত ভার্টিকেল ওপেনিং বা উলম্বভাবে প্রশারিত হয়ে জালের মাধ্যমে সমুদ্র তলদেশ স্পর্শ না করেই মাছ আহরণ করে থাকে।

মিডওয়াটার ট্রলারের আহরণ হার (CPUE) অন্যান্য প্রকৃতির ট্রলারের আহরণ হার অপেক্ষা অনেক বেশী। মিডওয়াটার ট্রলার সহযোগে মধ্যস্তরের ও পেলাজিক মাছ আহরণ করায় সমুদ্রের উৎপাদনশীলতা অক্ষুন্ন রেখেই মাছের বংশ বৃদ্ধি ও কিশোর মাছ রক্ষার মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। এ প্রকৃতির ট্রলার দ্বারা অতি অভিপ্রয়ানশীল মাছ সার্ডিন, আইলা, চাঁপাকুড়ি, বিভিন্ন প্রজাতির টুনা অধিক হারে আহরণ করা হয়।

সামুদ্রিক মৎস্য বিশেষজ্ঞ Lamboeuf (১৯৮৭ খ্রি.) এবং Saetre (১৯৮১ খ্রি.) কর্তৃক পরিচালিত এক জরিপে বঙ্গোপসাগরের গভীরে এবং আন্তর্জাতিক জলসীমায় যথেষ্ট পরিমান বড় পেলাজিক মাছের উপস্থিতি দেখা যায়। বিগণ কয়েক বছরে বাংলাদেশের একান্ত অর্থনৈতিক এলাকার বাইরে আন্তর্জাতিক জলসীমায় অভিপ্রয়াণশীল বড় পেলাজিক মাছ আহরণ নিমিত্ত বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে লং লাইনার ও পার্ন সেইনার প্রকৃতির ফিসিং ভেসেল আমদানীর অনুমতে দেয়া হলেও অদ্যাবধি কোন প্রতিষ্ঠান কোন ফিশিং ভেসেল আমদানী করে নাই। তবে ইতোমধ্যেই সরকার টুনা মাছ আহরণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে মৎস্য অধীদপ্তরাধীন একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

বিশ্বপরিমন্ডলে ব্লু-ইকোনমি বা সুনীল অর্থনীতি আজ এক আলোচিত বিষয়। আর তাই বর্তমানে বিশ্বব্যাপী সমুদ্রের বুকে সঞ্চিত থাকা অফুরন্ত সম্পদের খোঁজে মানুষ ক্রমাগণ সমুদ্রের দিকেই ধাবিত হচ্ছে। বাংলাদেশের মুল ভূখন্ডের প্রায় সমআয়তনের এক বিস্তীর্ণ সামুদ্রিক জলসীমা এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম চাবিকাঠি। বিগণ ২০১২ এবং ২০১৪ সনে প্রতিবেশী দেশসমুহের সাথে সমুদ্র সীমা নিয়ে দীর্ঘদিনের বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির ফলে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশ তার মুল ভূখন্ডের ৮১ শতাংশের সমপরিমান অর্থাৎ ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটার জলসীমা অর্জন করে। এ বিস্তীর্ণ জলরাশির জল স্তম্ভ, সমুদ্রতল ও মৃত্তিকাকে ঘিরে আবর্তিত আমাদের সুনীল অর্থনীতি। সামুদ্রিক মৎস্যখাত এ সুনীল অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি খাত। আমাদের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে গিয়ে এ খাতের উপর চাপ ক্রমাগণ বেড়েই চলেছে। এ প্রেক্ষাপটে আমাদের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘমেয়াদী সুচিন্তিত বিজ্ঞান ভিত্তিক পরিকল্পনা ও তার সঠিক ব্যবস্থপনা। মৎস্য অধিদপ্তরাধীন সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর ও সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট দেশের এ গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের ব্যবস্থাপনা, জরিপ ও গবেষণা এবং উন্নয়নের জন্য নিয়োজিত রয়েছে।

৩.১ সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর

বাংলাদেশের সুবিশাল জলরাশির গুরুত্বপূর্ণ মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্থায়িত্বশীল আহরণ নিশ্চিত করে সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সালে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর বিভাগ হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। বিভাগটি এক পর্যায়ে শিল্প বিভাগের অধীনস্থ একটি দপ্তর হিসেবে পরিচালিত হয়। অবশেষে বাস্তব প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশের অধিনস্ত একটি দপ্তর হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এটি বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলার ও মৎস্য নৌযান কর্তৃক সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জলসীমায় মৎস্য আহরণ সংক্রান্ত সকল প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বঙ্গোপসাগরের মৎস্যসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন আইন ও বিধি মোতাবেক সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ কর্মকান্ডসহ এর ব্যবস্থাপনাগণ কার্যক্রম পরিচালনা করাই এ দপ্তরের প্রধান উদ্দেশ্য। এ দপ্তরের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের মধ্যে রয়েছেঃ

৩.১.১ লাইসেন্সিং কার্যক্রম

সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ এলাকায় বা গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের জন্য প্রতিটি বৈধ বাণিজ্যিক ট্রলার বা যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের ফিশিং লাইসেন্স গ্রহণ এবং আর্টিসনাল নৌযানের জন্য মৎস্য আহরণের অনুমতি গ্রহণ বাধ্যতামূলক। সামুদ্রিক মৎস্য আইন-২০২০ এর তৃতীয় অধ্যায় ধারা ৮ এর উপধারা (১) এ বাণিজ্যিক ট্রলারের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত ফিশিং লাইসেন্স ইস্যুকরণের ক্ষমতা পরিচালক (সামুদ্রিক) এর ওপর ন্যস্ত করা হয়।

সরকার কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার অনুকূলে ক্যাটাগরি নির্ধারণপূর্বক বিদেশ হতে ট্রলার আমদানি বা ক্রয় অথবা দেশে নুন ট্রলার নির্মাণের অনুমতি প্রদান করে। উক্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রোফরমা ইনভয়েজ অনুমোদন সাপেক্ষে ট্রলার আমদানি, নির্মাণ বা ক্রয়পূর্বক প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসহ নৌবাণিজ্য দপ্তরে রেজিস্ট্রেশন ও ফিটনেস সনদ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করে থাকে। নৌবাণিজ্য দপ্তরের রেজিস্ট্রেশন ও ফিটনেস সনদ প্রাপ্তির পর নৌযানের মালিক পক্ষের যথাযথ আবেদনের প্রেক্ষিতে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর হতে ফিশিং লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

৩.১.১.২ যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান

সামুদ্রিক মৎস্য আইন-২০২০ অনুযায়ী ট্রলিং বা লং লাইনিং বা পার্সেনিং পদ্ধতি ব্যতীত ইঞ্জিন চালিত নেট ১৫ (পনেরো) টন এর বেশী ধারণ ক্ষমতার নৌযান সমুহকে যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান নামে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। সমুদ্র ও উপকূলীয় জলসীমানায় মৎস্য আহরণে নিয়োজিত সকল যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের লাইসেন্স থাকা আবশ্যক। নৌ বাণিজ্য দপ্তর হতে রেজিস্ট্রেশন ও সার্টিফিকেট অব ইন্সপেকশন (ফিটনেস সার্টিফিকেট) প্রাপ্তি সাপেক্ষে ও নির্ধারিত লাইসেন্স ফি ও ভ্যাট পরিশোধ পূর্বক যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের অনুকূলে লাইসেন্স

প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে হয়। ফিশিং লাইসেন্স নবায়নের জন্য শুধুমাত্র হালনাগাদ ফিটনেস সার্টিফিকেট, নির্ধারিত লাইসেন্স নবায়ন ফি ও ভ্যাট পরিশোধপূর্বক আবেদন করতে হয়।

৩.১.১.৩ আর্টিসনাল মৎস্য নৌযান

সামুদ্রিক মৎস্য আইন-২০২০ অনুযায়ী নেট ১৫ (পনেরো) টন বা তার নীচের ধারণ ক্ষমুার নৌযান সমুহকে আর্টিসনাল নৌযান হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। উক্ত আইন এর ধারা ২১ অনুযায়ী প্রত্যেক আর্টিসনাল নৌযানকে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ এলাকায় মৎস্য আহরণের জন্য সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের পরিচালকের নিকট হতে অনুমতিপত্র গ্রহনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের জন্য নিদিষ্ট ফি পরিশোধ সাপেক্ষে আর্টিসনাল মৎস্য নৌযান এর অনুমতিপত্র গ্রহণের উল্লেখ রয়েছে।

৩.১.২ বাণিজ্যিক ট্রলার ও মৎস্য নৌযান মনিটরিং, কন্ট্রোল এবং সার্ভেল্যান্স কাযর্ক্রম

৩.১.২.১ বাণিজ্যিক ট্রলার মনিটরিং, কন্ট্রোল এবং সার্ভেল্যান্স

বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক এলাকায় বাণিজ্যিক মৎস্য আহরণের জন্য চিংড়ি, বটম, মিড ওয়াটার এবং ট্রায়াল ক্যাটাগরির মোট ২৬২টি ট্রলার অনুমতি প্রাপ্ত হলেও বুর্মানে প্রায় ২৩৪ টি বাণিজ্যিক ট্রলার মৎস্য আহরণে নিয়োজিত রয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্য আইন-২০২০ এর ধারা ৩২ অনুযায়ী সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের কর্মকর্তাগণ বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলারের মৎস্য আহরণ কার্যক্রম পরিদর্শন, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন।

(ক) মৎস্য এবং চিংড়ি আহরণ নিমিত্ত সমুদ্রযাত্রার অনুমতি প্রদান

সাগরে মৎস্য আহরণে যাওয়ার পূর্বে প্রতিটি বাণিজ্যিক ট্রলারের অনুকুলে নির্ধারিত ফি পরিশোধকরতঃ সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর হতে সমুদ্রযাত্রার অনুমতিপত্র গ্রহণ বাধ্যতামুলক করা হয়েছে। নৌ বাণিজ্য দপ্তর হতে জারীকৃতসার্টিফিকেট অব ইন্সপেকশন এ অনুমোদিত মেয়াদ ও শর্তপূরণ সাপেক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর প্রতি ট্রিপে সমুদ্রযাত্রার অনুমতি প্রদান করা হয়ে থাকে। ফ্রিজার ট্রলারগুলোর ক্ষেত্রে প্রতি ট্রিপে সর্বোচ্চ ৩০ দিন এবং নন-ফ্রিজার ট্রলারগুলোকে প্রতি ট্রিপে সর্বোচ্চ ১৩ দিনের জন্য সমুদ্রযাত্রার অনুমতি প্রদান করা হয়।

(খ) ট্রলার পরিদর্শন ও মনিটরিং

সামুদ্রিক মৎস্য আইন-২০২০ এর ধারা ৩৩ এবং সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা-১৯৮৩ এর বিধি-৭ উপবিধি (i) মোতাবেক মৎস্য অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে মৎস্য অবুরণ ও প্রাক জাহাজীকরণে বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সে প্রেক্ষিতে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে নিয়োজিত সকল মৎস্য নৌযান ও ট্রলার সমুদ্রযাত্রার পূর্বে ও মৎস্য আহরণ শেষে বন্দরে প্রত্যার্বুনের পর দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্বাচিত কর্মকর্তা সরেজমিনে উপস্থিত হয়ে ট্রলার পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকেন।

৩.১.২.২ যান্ত্রিক ও আর্টিসনাল মৎস্য নৌযান মনিটরিং, কন্ট্রোল ও সার্ভেল্যান্স

কক্সবাজার হতে সাতক্ষীরা পর্যন্ত বিস্তৃত বাংলাদেশের সামুদ্রিক ও উপকূলীয় ৭১০ কি.মি. বিস্তৃত জলাশয়ে প্রায় ৫ লক্ষাধিক মৎস্যজীবি জেলে যান্ত্রিক ও আর্টিসনাল মৎস্য নৌযান দ্বারা মৎস্য আহরণ করছে। মৎস্য অধিদপ্তরাধীন বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি প্রকল্প কর্তৃক ২০১২-১৩ সালে পরিচালিত জরিপ প্রতিবেদন অনুযায়ী বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন উপকূলীয় এলাকায় মোট ৩২,৮৫৯টি যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান (সামুদ্রিক মৎস্য আইন অনুযায়ী যা যান্ত্রিক ও আর্টিসনাল নৌযান) মৎস্য আহরণে নিয়োজিত রয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়।

সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে নিয়োজিত এসব যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানসমুহের লাইসেন্স ইস্যু, নবায়ন, আহরিত মৎস্যের পরিমান ও প্রজাতি পর্যবেক্ষণ ও তথ্যাদি সংগ্রহসহ এণদসংক্রান্ত সকল প্রকার নজরদারী কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইতোপূর্বে সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশের অংশ-২ ধারা-৬ এর উপধারা-২ অনুযায়ী উপকূলীয় ১৪ টি জেলার জেলা মৎস্য কর্মকর্তাবৃন্দকে ক্ষমুা অর্পণ করা হয়েছিল। সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, বাংলাদেশ নৌ বাহিনী এবং বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড প্রতিনিয়ত মৎস্য নৌযানের রেজিস্ট্রেশন, ফিটনেস সার্টিফিকেট ফিশিং লাইসেন্সসহ অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় সরঞ্জামাদির উপস্থিতি যাচাই করতে মৎস্য নৌযানসমূহ মনিটরিং করা হয়। এছাড়া লাইসেন্সবিহীন নৌযানের লাইসেন্সিং কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের আওতায় নৌবাণিজ্য দপ্তরের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে উপকূলীয়

জেলাসমূহে সংশ্লিষ্ট অংশীজন সহযোগে উদ্বুদ্ধকরণসভা এবং যৌথ ক্যাম্পের মাধ্যমে ফিশিং লাইসেন্স ইস্যু ও লাইসেন্স নবায়ন করা হয়ে থাকে।

৩.১.৩ ট্রলার ও নৌযান পরিদর্শনে বিভিন্ন সংস্থার সাথে যৌথ কার্যক্রম

বঙ্গোপসাগরে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ট্রলার ও নৌযানসমুহ নিবিড় মনিটরিং, কন্ট্রোল ও সার্ভেল্যান্স এর আওতায় আনয়ণের লক্ষ্যে প্রায়শঃ বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সহ যৌথভাবে ট্রলার ও নৌযান পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম বাস্তবায়ণ করা হয়। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের জলসীমায় বিদেশি ট্রলার ও নৌযানের অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধসহ দেশিয় মৎস্য ট্রলার ও নৌযান কর্তৃক মৎস্য আহরণে নন-কমপ্লাইন্স অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

৩.১.৪ মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণে সচেতনা বৃদ্ধি কার্যক্রম

দেশের এ গুরুত্বপূর্ণ সম্পদকে মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক হারে কাজে লাগানোর জন্য দরকার এ সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গ্রহণ। এর উপর নির্ভরশীল ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে এ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে সহব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করার মাধ্যমে এ সম্পদকে সংরক্ষণ করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে সামুদ্রিক মৎস্য আইন ও তদাধীনে প্রণীত বিভিন্ন বিধিমালা অনুযায়ী মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, স্থায়ীত্বশীল মৎস্য আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভিপ্রায়ে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর হতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণ ও পরামর্শপ্রদানমূলক সভা আয়োজন করা হয়ে থাকে। পাশাপাশি সামুদ্রিক মৎস্য আইন বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সকল স্তরের অংশীজনদের সমন্বয়ে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে মুবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়ে থাকে।

৩.২.২ সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট এর কার্যক্রম

সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ও ব্যবস্থাপনা ইউনিট, চট্টগ্রাম এর আগ্রাবাদ এলাকায় সরকারী কার্যভবন-০২ (৭ম তলা) এ অবস্থিত। কক্সবাজার এডিবি হ্যাচারী ক্যাম্পাসে অত্র দপ্তরের একটি শাখা অফিস রয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, চট্টগ্রাম সদর দপ্তরের নিয়ন্ত্রণে “আর. ভি. অনুসন্ধানী” ও “আর. ভি. মাছরাঙ্গা” নামে দু'টি গবেষণা জাহাজ ছিল যা র্বুমানে অকেজো অবস্থায় বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তবে র্বুমানে অত্র দপ্তর হতে “আর. ভি. মীনসন্ধানী” নামক গবেষণা জাহাজের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের মজুদ ও আহরণমাত্রা নির্ধারণে জৈব তাত্বিক গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট বিগণ সময়ে বঙ্গোপসাগরে নিয়মি ক্রুজ পরিচালনা মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্য জরিপের কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত বিভিন্ন জরিপে ৪টি মৎস্য ও চিংড়ী মজুদ ক্ষেত্র নির্ধারণ, তলদেশীয় মৎস্য ও চিংড়ীর মজুদ নিরূপণ ও সহনশীল আহরণমাত্রা, পেলাজিক মাছের মজুদ ও ষ্ট্যান্ডিং স্টক সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়।

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের আহরণ গতিধারা

৪.১ ২০১০-১১ অর্থ বছর পূববর্তী মৎস্য উৎপাদন

প্রাচীনকাল থেকেই সমুদ্র মানুষের জীবন-জীবিকাসহ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের অন্যতম উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। স্বাধীনুার পর থেকে আজ অবধি দেশের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ সেক্টরের সাথে সম্পৃক্ত। স্বাধীনুার পর মাত্র কয়েকটি বাণিজ্যিক ট্রলার দিয়ে সাগরে মৎস্য আহরণ শুরু হলেও বর্তমানে প্রায় ২ শতাধিক ট্রলার সমুদ্রে এবং ৬৭ হাজারের অধিক যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক মৎস্য নৌযান উপকূলীয় জলসীমনায় মৎস্য আহরণে নিয়োজিত রয়েছে। বিশেষজ্ঞগণের মতে অধিক সংখ্যক মৎস্য নৌযান মৎস্য আহরণে নিয়োজিত থাকায় সাগরের চিংড়ি ও মাছের ওপর আহরণের চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে যা ভবিষ্যতে সহনশীল মৎস্য আহরণে বাধার সৃষ্টি করতে পারে। বিগণ ২০০৮-০৯ অর্থবছরের আগে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের আহরণ গতিধারা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে সামুদ্রিক মাছের উৎপাদন ৩.০ লক্ষ মে.টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে প্রায় ৫.০ লক্ষ মে.টন এ উন্নীত হয়েছে। এ সময়ে বানিজ্যিক সেক্টরের অবদান ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে শতকরা ৬.৮৫ ভাগ থেকে কিছু হ্রাস পেয়ে ২০০৯-১০অর্থ বছরে এসে ৬.৬১ ভাগ হয়েছে। অপরদিকে একই সময়ে আর্টিস্যানাল ফিশারীজের অবদান শতকরা ৯৩.১৫ ভাগ থেকে কিছুটা বেড়ে ৯৩.৩৯ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে (DoF, Statistical year Book)।

৪.২ ২০১০-১১ অর্থ বছর পরবর্তী মৎস্য উৎপাদন

আমাদের দেশের ক্রমবর্ধিষ্ণু মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ১১ ভাগ মৎস্য সেক্টরে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নিয়োজিত রয়েছে। বর্তমানে ৩২ টি চিংড়ি ট্রলার, ৪৬ টি বটম ট্রলার, ৩১টি ট্রায়াল ট্রলার ও১২৫ টি মিডওয়াটার ট্রলার এবং ৩২ হাজারের বেশী যান্ত্রিক নৌযান সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে নিয়োজিত রয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে সামুদ্রিক মাছের মোট উৎপাদন ৬,৭১,১০৪ মে. টনে উন্নীত হয়েছে, তন্মধ্যে বাণিজ্যিক মৎস্য সেক্টরের অবদান ১,১৫,৩৫৪ মে.টন (শতকরা ১৭.১৯ ভাগ) এবং আর্টিসেনাল সেক্টরের অবদান ৫,৫৫,৭৫০ মে.টন (শতকরা ৮২.৮১ ভাগ)। ২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০ অর্থ বছর পর্যন্ত সামুদ্রিক মাছের আহরণ গতিধারা বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, বিগণ দশ বছরে সামগ্রিক ভাবে সামুদ্রিক মাছের উৎপাদন ২২.৮৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে আর্টিসেনাল সেক্টরের আনুপাতিক অবদান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেলেও বাণিজ্যিক সেক্টরের মৎস্য উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রসংগণ উল্লেখ্য যে, বাণিজ্যিক ট্রলারে আহরিত মাছের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যবান ছোট আকারের প্রজাতির মাছের প্রাচুর্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অবস্থা পরিবর্তন ঘটিয়ে মুল্যবান প্রজাতির প্রাপ্যতা বাড়াতে সমুদ্র ও উপকূলীয় মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সর্বোচ্চ সহনশীল মৎস্য আহরণে উপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজন।

বাংলাদেশ Pilot Country হিসেবে Blue Growth Economy নামে অভিহিত সমুদ্র অর্থনীতিতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। সম্ভাবনাময় সমুদ্র সম্পদ কাজে লাগাতে বিদ্যমান মৎস্য আহরণের পাশাপাশি গভীর সমুদ্রের দ্রুত অভিপ্রয়াণশীল প্রজাতি যেমন- টুনা ও টুনা জাতীয় বড় আকারের পেলাজিক মাছ আহরণের লক্ষ্যে Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) তে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে Cooperating Non-contracting Party Status (CNPS) অর্জন করেছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা বিধান এবং রপ্তানী আয় বৃদ্ধিতে এ খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

৪.৩ উপকূলীয় ও ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য আহরণের গতিধারা

আর্টিসেনাল বা ক্ষুদ্রায়তন ফিশারিজ বলতে সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল, মোহনা অঞ্চল, দ্বীপাঞ্চল এবং ম্যানগ্রোভ অঞ্চলে সর্বোচ্চ জোয়ারে ৪০ মিঃ গভীরতা পর্যন্ত বিস্তৃর্ণ জলরাশিতে ক্ষুদ্রায়তন জেলে সম্প্রদায় কর্তৃক তাদের নৌযান ও সরঞ্জামাদি ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্য আহরণকে বোঝায়। সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদনের সিংগভাগই (শতকরা ৮৩ ভাগ) আহরিত হয় আর্টিসেনাল মৎস্য সেক্টর থেকে। উপকূলীয় জেলে সম্প্রদায় কর্তৃক আর্টিসেনাল ফিশারিজে আহরিত বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন কতিপয় মৎস্য প্রজাতি বা গ্রুপের আহরণ গতিধারা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

৪.৩.১ ইলিশ (Shad)

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ; ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। জাতীয় অর্থনীতিতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কর্মসংস্থান ও আমিষ জাতীয় খাদ্য সরবরাহে এ মাছ অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণে সরকারের গৃহীত বাস্তবমুখী পদক্ষেপের ফলে এ মাছের উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০-১১ অর্থ বছওে আর্টিস্যানাল উৎস হতে ইলিশের উৎপাদন ২,২৫,৩০২ মে.টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯-২০ অর্থ বছওে ২,৯৪,৯৫০ মে. টনে উন্নীত হয়েছে (টেবিল-১০ এবং চিত্র-১)।

৪.৩.২ লটিয়া/লইট্যা (Bombay Duck)

বঙ্গোপসাগরে প্রাপ্ত Harpadontidae পরিবারের একমাত্র সদস্য বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ লটিয়া মাছ (Bombay duck) স্বাদে ও পুষ্টিতে অনন্য। বৃটেন, সিংগাপুর, মধ্যপ্রাচ্য ও শ্রীলংকায় এ মাছ তাজা ও শুটকী অবস্থায় রপ্তানী হয়। এ মাছ সাগর উপকূল ও Neritic Zone (গভীর সমুদ্র) এ পাওয়া যায়। লটিয়া মাছের আহরণ ধারা পর্যবেক্ষণকালে দেখা যায় যে, ২০১০-১১ অর্থ বছরের তুলনায় ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে অনেক বৃদ্ধি পায় এবং ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৯-২০ পর্যন্ত আহরণহার কমলেও ক্রমান্বয়ে উর্দ্ধমুখী (টেবিল-১০ এবং চিত্র-১) রয়েছে।

৪.৩.৩ চিংড়ি (Shrimp)

চিংড়ি বাংলাদেশের অন্যতম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী প্রধান হিমায়িত রপ্তানিযোগ্য পণ্য। বঙ্গোপসাগরে ৩৬ প্রজাতির চিংড়ির মধ্যে বাগদা, হরিনা, রুডা, লইল্যা, বাগাতারা ও চাগা চিংড়ি বানিজ্যিক ও অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। চিংড়ির আহরণ ধারা পর্যবেক্ষণকালে দেখা যায় যে, ২০১০-১১ এর তুলনায় ২০১১-১২ অর্থ বছরে আহরণ কিছুটা বৃদ্ধি হলেও সাম্প্রতিক সময়ে উৎপাদন কিছুটা হ্রাস-বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্যনীয় (টেবিল-১০ এবং চিত্র-১)।

৪.৩.৪ পোয়া মাছ (Croaker)

বঙ্গোপসাগরে অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন ১৫ প্রজাতির বিভিন্ন আকারের পোয়া মাছ পাওয়া যায়। এ সকল মাছকে Jew fish/Croaker (Drums) বলা হয় কারণ এরা শব্দ সৃষ্টি করতে পারে। প্রজনন মৌসুমে এরা নিজেদের শব্দ শুনতে পায়। তলদেশীয় এ মাছ সামুদ্রিক বেহুন্দিজাল, বটম গিলনেট ও বড়শি দিয়ে আহরিত হয়। ২০১০-১১ অর্থ বছর থেকে ২০১৯-২০ পর্যন্ত উৎপাদন গতিধারায় হ্রাস-বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় (টেবিল-১০ এবং চিত্র-১)।

৪.৩.৫ রূপচান্দা (Silver Pomfret)

তিন প্রজাতির চান্দা (রূপচান্দা, ফলিচান্দা ও কালচান্দা) বঙ্গোপসাগরে পাওয়া যায়। এ মাছ সাধারনু সামুদ্রিক ও আধা-লবনাক্ত (Brackish) এলাকায় বিচরণ করে থাকে। বেন্থোপেলাজিক ও প্লাংটনভোজী এ মাছ এক্সিড্রোমাস প্রকৃতির। বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন এ মাছ তাজা, ফ্রোজেন ও শুটকী হিসেবে খুবই জনপ্রিয় ও উচ্চ মূল্যমান সম্পন্ন। রূপচান্দা মাছের আহরণ গতিধারায় ২০১০-১১ অর্থ বছর থেকে ২০১৯-২০ পর্যন্ত আহরণের নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা যায় (টেবিল-১০ এবং চিত্র-১)।

৪.৩.৬ কাঁটামাছ (Cat Fish)

বঙ্গোপসাগরে প্রাপ্ত ১৮ প্রজাতির বিভিন্ন আকারের কাঁটামাছ বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন। এদের বিষাক্ত গ্ল্যান্ড না থাকলেও কাঁটা মিউকাস যুক্ত ও বিষাক্ত। ফাঁস জাল ও বড়শি দিয়ে এ মাছ আহরণ করা হয়। সাধারনু বড় আকার ও স্বাদের কারণে মাংশাসী এ মাছ অতি আহরণের শিকার। এ মাছের আহরণ গতিধারায় ২০১০-১১ অর্থ বছরে ১৬,২১৬ মে. টন পরবর্তীতে ২০১১-১২ অর্থ বছরে কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও ২০১৯-২০ পর্যন্ত উৎপাদন ক্রমান্বয়ে নিম্নমুখী লক্ষ্যনীয় (টেবিল-১০ এবং চিত্র-১)।

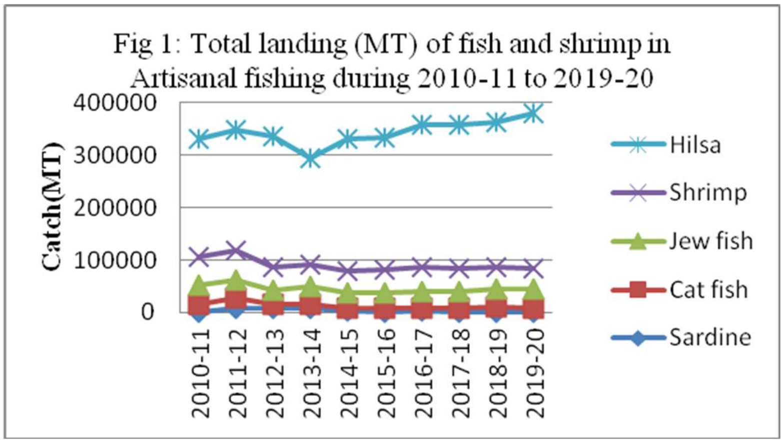

৪.৪ বাণিজ্যিক ট্রলারে মৎস্য আহরণের গতিধারা

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণে অনুমতিপ্রাপ্ত ২৬২ টি বানিজ্যিক ট্রলারের মধ্যে বুর্মানে বিভিন্ন প্রকৃতির সারা বছরে কম-বেশী ২৩৪ টি বাণিজ্যিক ট্রলার মৎস্য আহরণে নিয়োজিত রয়েছে। এ সকল ট্রলারের মধ্যে চিংড়ি ট্রলার, বটম বা ডিমার্সেল ট্রলার, মিডওয়াটার ট্রলার ও ট্রায়াল ট্রলার (বটম প্রকৃতির) অন্তর্ভুক্ত। সময়ের পরিসরে বাণিজ্যিক ট্রলার কর্তৃক আহরিত অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য প্রজাতির গোত্র ভিত্তিক প্রাচুর্যতার ব্যাপক তারতম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। মৎস্য মজুদ ও আহরণ এলাকার তুলনায় ট্রলার সংখ্যা ও তাদের অশ্ব শক্তি এবং মাছ ধরার সক্ষমা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে মৎস্য সম্পদের উপর অতিরিক্ত আহরণ চাপ সৃষ্টি হচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান।

ট্রলার কর্তৃক আহরিত মৎস্য সম্পদ বিশ্লেষণ কালে দেখা যায় যে, আহরিত মৎস্য সম্পদের মধ্যে অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ৩০টি গোত্রের ৯০টির অধিক মৎস্য ও চিংড়ি প্রজাতি রয়েছে। তবে বুর্মানে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ১৫টি গোত্রের মাছের মধ্যে Ariidae, Sciaenidae, Nemipteridae, Trichiuridae, Carangidae, Scombridae, Clupeidae, Pomadasyidae, Stromateidae, Harpadontidae, Engraulidae, Teraponidae, Lutjanidae, Cynoglossidae ও Polynemidae, Mollusk বিভাগের ১ টি শ্রেণি Cephalopoda (Squid, Cuttle fish, Octopus), Condrichthyes শ্রেণির ১টি উপশ্রেণি Elasombranchii এবং উপবিভাগ Crustacea এর দুটি গোত্র Penaeidae ও Portunidae অন্যতম। ট্রলার কর্তৃক আহরিত মৎস্য সম্পদের বাণিজ্যিক গুরুত্ব সম্পন্ন প্রজাতিগুলোর মধ্যে অধিক পরিমাণে আহরিত প্রজাতিসমূহের আহরণ গতিধারা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

৪.৪.১ সার্ডিন (Sardine)

বুর্মানে বানিজ্যিক মৎস্য সেক্টরে এককভাবে সর্বাধিক আহরিত প্রজাতি বা গ্রুপ হচ্ছে Clupidae পরিবারভুক্ত সার্ডিন মাছ। এ মাছের আহরণ তথ্য সংগ্রহ শুরু হয়। বিগণ ২০১১-১২ অর্থ বছর থেকে এ মাছের আহরণ গতিধারা ক্রমান্বয়ে উর্ধ্বমুখী লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০১১-১২ অর্থ বছরে উৎপাদন ছিল ১১,১০৫ মে.টন এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রায় চার গুণ বৃদ্ধি পেয়ে উৎপাদন হয়েছে ৪৬,১০৪ মে.টন (টেবিল-১০ এবং চিত্র-২)। মূলত মৎস্য ট্রলার সমূহ মিডওয়াটার ট্রলারে রূপান্তরিত হওয়ার ফলে অর্থাৎ মিড ওয়াটার ট্রলারের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় সার্ডিন মাছের আহরণ ক্রমান্বয়ে উর্ধ্বমুখী বলে ধারনা করা হচ্ছে। এছাড়াও বড় আকারের মুল্যবান মাছের আধিক্য কমে যাওয়ায় বুর্মানে সার্ডিনই ট্রল ক্যাচের লক্ষিত প্রজাতিতে (Target Species) পরিণত হয়েছে। যদিও ২০১৮-১৯ অর্থ বছর হতে আবার মোট উৎপাদন প্রবণতা নিম্নমূখী পরিলক্ষিত হচ্ছে।

৪.৪.২ ইলিশ (Shad)

বাণিজ্যিক ট্রলার কর্তৃক আহরণকৃত জাতীয় মাছ ইলিশের তথ্য সংগ্রহ ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে শুরু হলেও মিডওয়াটার ট্রলার কর্তৃক আহরণ মুলত: ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে শুরু হয়েছে এবং ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণে সরকারের বাস্তবমুখী পদক্ষেপের ফলে এ মাছের আহরণ গতিধারা ক্রমান্বয়ে উর্দ্ধমুখী লক্ষ্য করা যাচ্ছে (টেবিল-১০ এবং চিত্র-২)। অতিআহরণ রোধ, নদী দূষণ বন্ধ এবং প্রজনন পরিবেশ অক্ষুন্ন রাখলে এ সম্পদ জাতীয় অর্থনীতিতে আরও অবদান রাখতে পারবে বলে আশা করা যায়।

৪.৪.৩ পোয়া মাছ (Croaker)

বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন পোয়া মাছের আহরণ হার ২০১০-১১ বছরের (১,৩৪০ মে. টন) তুলনায় ২০১৮-১৯ সাল হতে পরবর্তী বছরগুলোতে ক্রমশঃ উর্দ্ধমুখী ধারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ এমাছও বুঁমানে অতিআহরণের শিকার বলে প্রতীয়মান হচ্ছে (টেবিল-১০ এবং চিত্র-২)।

৪.৪.৪ চিংড়ি (Shrimp)

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন চিংড়ির আহরণ হার ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে হ্রাস-বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় এবং ২০১০-১১ সাল হতে এতে নিম্নমুখী ধারা লক্ষনীয় তবে ২০১৩-১৪ এবং ২০১৭-১৮ সালে কিছুটা উর্দ্ধমূখী (টেবিল-৪ এবং চিত্র-২)। নির্বিচারে লার্ভা বা জুভেনাইল নিধন রোধ, সহনশীল পর্যায়ে মা চিংড়ি ধরার ট্রলার অনুমোদন, চিংড়ি হ্যাচারিতে মা চিংড়ি উৎপাদন এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক ও টেকসই চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা জোরদার করতে পারলে এ সম্পদ আরও অধিক পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা আনয়ন করতে সক্ষম হবে।

৪.৪.৫ কাঁটামাছ (Cat Fish)

বাজার দর এবং চাহিদার কারণে Ariidae পরিবারভুক্ত কাঁটা মাছের দিকে ট্রল ক্যাচের আকর্ষণ বেশী। বঙ্গোপসাগরে বিভিন্ন আকার ও প্রজাতির কাঁটা মাছ পাওয়া যায়। এ মাছের আহরণ ২০১০-১১ অর্থবছরে ছিল ৯৭৭ মে. টন যা পরবর্তীতে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে হ্রাস পেয়ে ৫,২২৩ মেঃ টন হয় । অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন এ মাছও বুঁমানে অতি আহরণের শিকার হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয় (টেবিল-১০ এবং চিত্র-২)।

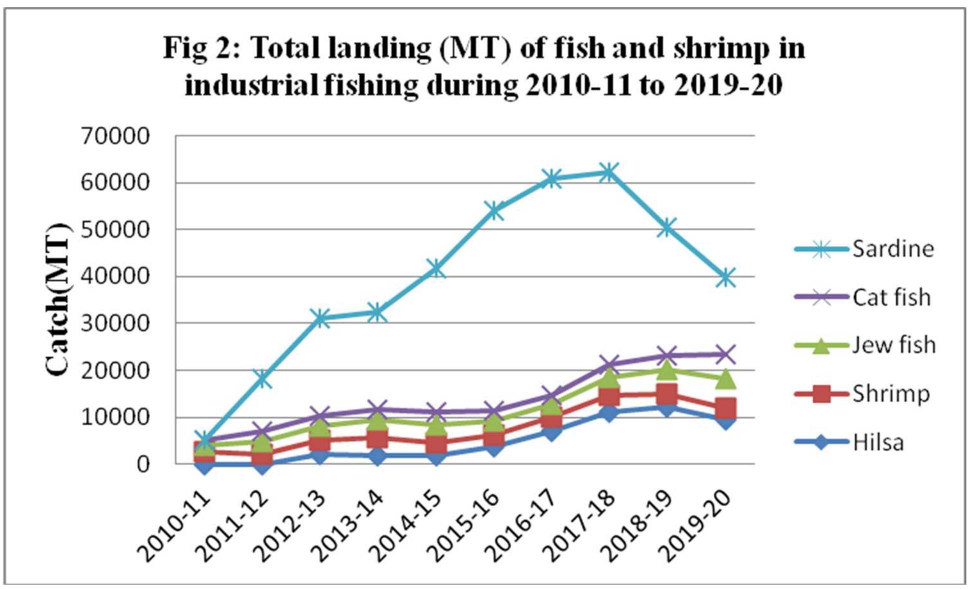

৪.৫ বেহুন্দী জাল (SBN) এ মৎস্য আহরণের গতিধারা

বেহুন্দী জাল ফানেল আকৃতির নন-সিলেক্টিভ জাল যা উপকূলীয় এলাকায় মৎস্য সম্পদ আহরণে অন্যান্য সরঞ্জামের তুলনায় সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। এ জাল দ্বারা সমুদ্রে যে সমস্ত মৎস্য বা চিংড়ি আহরিত হয়ে থাকে তার মধ্যে বানিজ্যিক ভাবে গুরুত্বসম্পন্ন প্রজাতি সমূহ হলো- লটিয়া, ছুরি, পোয়া, রুপচান্দা, ফলিচান্দা, কাঁটা মাছ, বাগাতারা ও লইল্যা চিংড়ি ন্যাদি অন্যতম।

বিসু ০৯ বছরের বেহুন্দি জালের প্রজাতি ভিত্তিক আহরণ তথ্য বিশ্লেষণে যে, ২০১০-১১ অর্থবছরে লটিয়া (*Harpadon nehereus*) মাছের সর্বোচ্চ আহরণ শতকরা ১১.১২ ভাগ ছিল এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আহরণ সর্বনিম্ন শতকরা ১০.৫৪ ভাগ ছিল। এছাড়া দ্বিতীয় প্রধান আহরিত প্রজাতি হল এসিটিস বা Sergestid Shrimp। এ মাছের সর্বোচ্চ শতকরা ২৭.৯৮ ভাগ এবং সর্বনিম্ন ১৪.০৬ ভাগ আহরণ ছিল যথাক্রমে ২০১২-১৩ এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে। এছাড়া ২০১৪-১৫ এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরে কাঁটা (*Arius sp.*) মাছ যথাক্রমে সর্বোচ্চ শতকরা ৬.১৩ ভাগ এবং সর্বনিম্ন ২.০৩ ভাগ আহরিত হয়েছে। অন্যদিকে পোয়া (Croaker/Jew)

মাছের সর্বোচ্চ আহরণ ছিল শতকরা ৬.৭১ ভাগ ২০১০-১১ অর্থ বছরে এবং সর্বনিম্ন আহরণ ৩.৬০ ভাগ হয়েছে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে। ছুরি (Ribbon) মাছের সর্বনিম্ন আহরণ ১.০৬ ভাগ হয়েছে ২০১৯-২০ সালে (চিত্র-৪)। ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে এসিটিস বেহুন্দি জালে অধিক পরিমাণে ধরা পড়ে, কারণ এই সময় (শীতকাল) পানির লবনাক্ততা বৃদ্ধি পায়, স্রোত কম থাকে এবং এসিটিস এই সময়ে গভীর সমুদ্র হতে মোহনায় অভিপ্রয়াণ করে। আবার এপ্রিল, মে , জুন ও জুলাই মাসে লটিয়া মাছ অধিক পরিমাণে ধরা পড়ে এবং এই সময়ে চেউয়া মাছও মোহনা অঞ্চলে বেশী আহরিত হয়। বিশ্লেষণে দেখা যায়, লটিয়া মাছের আহরণ পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেলেও এসিটিস মাছের আহরণ পর্যায়ক্রমে হ্রাস পায়।

এছাড়া বেহুন্দি জালে আহরিত কম বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন মৎস্য সম্পদ যেমন– থুইট্যা হাঙ্গর, হাউস, আইলা, ফাইস্যা, রুডা চিংড়ি, হরিণা চিংড়ি, সাদা পোয়া, টেক চান্দা, হাতির কান, অলুয়া ন্যাদি অন্যতম। তবে মোহনা বেহুন্দি জালের ফাঁস খুবই ছোট এবং কম গভীরতায় এ জাল ব্যবহৃত হয় বিধায় এ জালে মৎস্য সম্পদের ডিম, পোনা, আংগুলি পোনা ও কিশোর পোনা ন্যাদি নির্বিচারে আহরিত হয় বিধায় মোহনা বেহুন্দি জাল দ্বারা মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

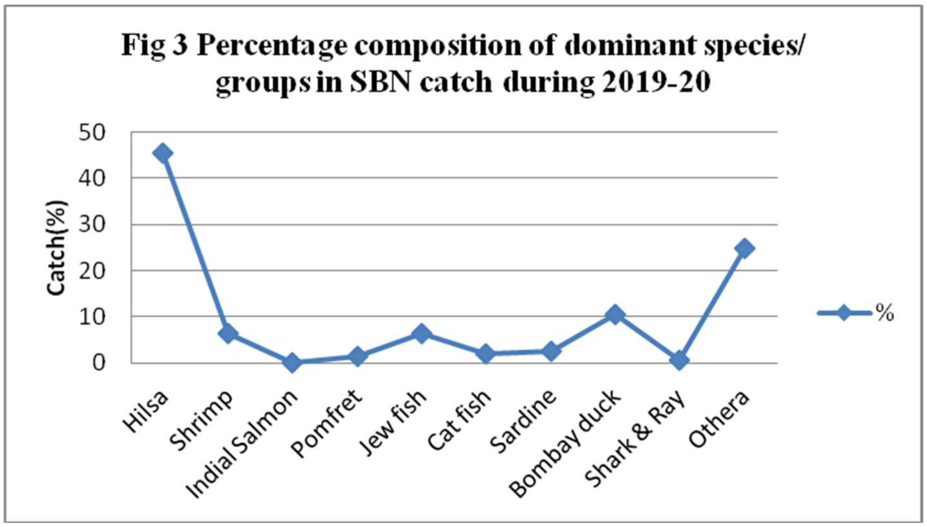

টেবিল ১১: এক নজরে বঙ্গোপসাগর থেকে আহরিত (২০১০-২০ খ্রি.) গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি সমূহের উৎপাদন গতিধারা

গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি	মৎস্য আহরণ গতিধারা			
	আর্টিসেনাল ফিশারিজ	প্রতীকী বৈশিষ্ট্য	ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ফিশারিজ	প্রতীকী বৈশিষ্ট্য
ইলিশ	ইলিশের উৎপাদন ২০১০-১১ অর্থ বছরে আর্টিসেনাল উৎস্য হতে ইলিশের উৎপাদন ২,২৫,৩০২ মে.টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ২,৯৪,৯৫০ মে. টনে উন্নীত হয়েছে। কারণ ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণে সরকারের বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ।	⇧	বানিজ্যিক ট্রলারে আহরিত ইলিশের তথ্য সংগ্রহ ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে শুরু হয়েছে এবং ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত ইলিশ আহরণ গতিধারা ক্রমান্বয়ে উর্দ্ধমুখী।	⇧
চিংড়ি	চিংড়ির আহরণ ২০১০-১১ এর তুলনায় ২০১১-১২ অর্থ বছরে কিছুটা বেশী হলেও এর পরবর্তী বছরগুলোতে আহরণ হ্রাসের প্রবণতা লক্ষ্যনীয়।	⇓	চিংড়ির আহরণ হার ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে পর্যায় ক্রমিকভাবে উঠা-নামা করছে এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছর হতে এতে নিম্নমুখী ধারা লক্ষ্যনীয়।	
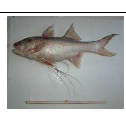 লাক্কা	২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০এ লাক্কা মাছের আহরণ ধারা ক্রমান্বয়ে নিম্নমুখী।	⇩	লাক্কা মাছের ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য পরিমান আহরণ পরিলক্ষিত হয়নি।	--

রূপচান্দা	রূপচান্দা মাছের আহরণ ২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত নিম্নমুখী দেখা যায়।	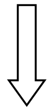	রূপচান্দা মাছের আহরণ ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত হ্রাস-বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।	
পোয়া	পোয়া মাছের আহরণ ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০ পর্যন্ত হ্রাস-বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।		পোয়া মাছের আহরণ ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত ক্রমশঃ উর্দ্ধমুখী ধারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।	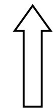
কাঁটামাছ	কাঁটা মাছের আহরণ ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০ পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে নিম্নমুখী লক্ষ্যনীয়।	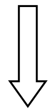	কাঁটা মাছের আহরণ ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত ক্রমশঃ উর্দ্ধমুখী ধারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।	⇑
সার্ডিন	সার্ডিন মাছের আহরণ তথ্য সংগ্রহ ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত চলমান রয়েছে। তবে এ ধারায় ক্রমান্বয়ে নিম্নমুখীভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে।	⇓	বানিজ্যিকট্রলারে সার্ডিন মাছের আহরণ তথ্য সংগ্রহ ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে শুরু হয়। ট্রল ক্যাচের লক্ষিত প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে আহরণ ক্রমান্বয়ে উর্ধ্বমুখী লক্ষ্য করা যাচ্ছে।	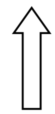
লটিয়া	লটিয়া মাছের আহরণ ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে উর্দ্ধমুখী হয়েছে।	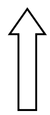	লটিয়া মাছের আহরণ তথ্য সংগ্রহ ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তী বছর থেকে ট্রল ক্যাচে উল্লেখযোগ্য পরিমান পরিলক্ষিত হয়নি।	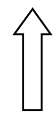
হাঙ্গর ও হাউস	হাঙ্গর ও হাউস মাছের আহরণ হার ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে হ্রাস-বৃদ্ধি পেয়েছে।		হাঙ্গর ও হাউস আহরণ তথ্য মুলতঃ ২০১২-১৩ বছর থেকে সংগৃহীত হচ্ছে যা পরবর্তী কয়েক বছরে আহরণ ক্রমশঃ উর্দ্ধমুখী পরিলক্ষিত হলেও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে হ্রাস পেয়েছে।	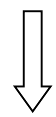

সামুদ্রিক মৎস্য আইন এবং সামুদ্রিক মৎস্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি

ভৌগলিক অবস্থান এবং পরিবেশগণ কারণে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। সুনীল অর্থনীতিতে (Blue Economy) মৎস্য সেক্টর একটি উল্লেখযোগ্য সেক্টর হিসেবে অবদান রাখছে। ভবিষ্যতে বিশ্বব্যাপী দরিদ্রতা দূরীকরণে ও খাদ্যের চাহিদা পূরণে সামুদ্রিক মৎস্য বড় ভূমিকা রাখবে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। দিন দিন বিশ্বব্যাপী মানুষের সামুদ্রিক উৎসের প্রতি নির্ভরশীলতা বাড়ছে। যার ফলশ্রুতিতে সামুদ্রিক পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্য হুমকির মধ্যে পড়ছে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদসহ অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী এবং একই সাথে সামুদ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক মহল প্রচুর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জাতিসংঘের এসডিজি লক্ষ্যমাত্রায় এর প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়। সামুদ্রিক জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং সামুদ্রিক উৎস থেকে সম্পদ আহরণে নির্দেশমালা অনুযায়ী অনেকগুলো আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক সনদ এবং আইন কার্যকর রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সহ অন্যান্য জলজ প্রাণী এবং সামুদ্রিক দূষণ রোধ ও পরিবেশ রক্ষায় বদ্ধ পরিকর এবং এসংশ্লিষ্ট অধিকাংশ আন্তর্জাতিক সনদ ও আইনে ইতোমধ্যেই স্বাক্ষর করেছে। নিম্নে সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই আহরণ এবং সংরক্ষণে উল্লেখযোগ্য সনদ ও আইনসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হল:

৫.১ সামুদ্রিক মৎস্য আইন ২০২০

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং টেকসই আরহরণ নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে এবং সামুদ্রিক মৎস্য সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক আইন ও সনদসমূহকে বিবেচনা করে সামুদ্রিক মৎস্য আইন ২০২০ প্রণয়ন করা হয়। উক্ত আইন সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন কর সম্ভব হলে বাংলাদেশের সমুদ্র অঞ্চলে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে ধারণা করা হচ্ছে। সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় সামুদ্রিক মৎস্য আইন ২০২০ এর উল্লেখযোগ্য ধারানসমূহ হলো-

২ (৩) আর্টিস্যানাল নৌযান: কোন মৎস্য নৌযান যাহার ধারণ ক্ষমা নেট ১৫ টন বা তাহার নিচে।

২ (১৮) যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান অর্থ ট্রলিং বা লংলাইনিং বা পার্সেনিং পদ্ধতি ব্যতীয় ইঞ্জিন চালিত কোন মৎস্য নৌযান যাহার ধারণ ক্ষমা নেট ১৫ টন এর বেশি।

৪। নৌযানের শ্রেণি ও সংখ্যা নির্ধারণ: মৎস্য স্পদের সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, টেকসই ও আহরণযোগ্য মজুদ বজায় রাখিবার জন্য এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজনে সরকার সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ এলাকায় বা গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের নৌযানের সংখ্যা নির্ধারণ এবং শ্রেণিবিন্যাস করতে পারবে।

৭ (২) কোন ব্যক্তি সরকারের নিকট থেকে অনুমতি ব্যতিরেখে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ এলাকায় বা গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ করিলে বা করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিলে উক্ত কার্য একটি অপাধ এবং এই অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৩ বছরের কারাদন্ড বা অনধিক ১ কোটি টাকা অর্থদন্ড দন্ডিত হবে এবং মৎস্য নৌযান ও অন্যান্য সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত হবে।

১৬। সমুদ্র যাত্রার অনুমতিপত্র, আগমনী বার্তা ইণ্যাদি: প্রত্যেক লাইসেন্সপ্রাপ্ত মৎস্য নৌযানকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালকের নিকট হইতে সমুদ্র যাত্রার অনুমতিপত্র গ্রহণ করিতে হবে। মৎস্য নৌযানকে সমুদ্রে যাত্রার বিষয়, সমুদ্রে অবস্থানকালীন মেয়াদ, মৎস্য আহরণের লগবুক ও স্ট্যাকিং শীট সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করিতে হবে।

১৭। ধৃত মৎস্য সম্পর্কে তথ্য সরবরাহের দায়িত্ব: সমুদ্র যাত্রার অনুমতিপ্রপ্ত ব্যক্তি আহরণকৃত মৎস্য সংক্রান্ত বিবরণী এবং বিক্রয় সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য নির্ধারিত ফরম ও পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করিবে এবং উহার অনুলিপি পরিচালকের নিকট দাখিল করিবে।

২১। আর্টিস্যানাল নৌযানের অনুমতি: প্রত্যেক আর্টিস্যানাল নৌযানের মালিককে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ এলাকায় মৎস্য আহরণের অনুমতির জন্য, নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালকের নিকট আবেদন করতে হবে।

(৩) অনুমতিপ্রাপ্ত আর্টিস্যানাল নৌযান ব্যতীত অন্য কোন আর্টিস্যানাল নৌযান সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ এলাকায় মৎস্য আহরণ করতে পারবে না।

(৫) এই ধারার অধীন প্রদত্ত অনুমতি সরকার বা পরিচালক কর্তৃক পুনরাদেশ দ্বারা বাতিল না করা পর্যন্ত বহাল থাকবে।

(৮) এই ধারার অধীন অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত কোন আর্টিস্যানাল নৌযান সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ এলাকায় মৎস্য আহরণ করিলে আহরিত মৎস্যের সমপরিমাণ মূল্য প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ এবং আহরিত মৎস্য বাজেয়াপ্ত করা যাবে।

২৪। লাইসেন্স ব্যতীত বিদেশি মৎস্য নৌযান কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ- (বাংলাদেশের জলসীমায় প্রবেশ, মৎস্য আহরণ বা আহরণের উদ্যোগ, বেআইনিভাবে মৎস্য পরিবহন বা পাচার, জ্বালানি সরবরাহ বোঝাই বা খালাশ।

২৭। বিস্ফোরক, বিষ বা অন্য কোন ক্ষতিকর দ্রব্য ইণ্যাদির ব্যবহার নিষিদ্ধ।

২৮। নিষিদ্ধ ঘোষিত জাল, সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি। নির্ধারিত আকারের জাল ব্যতীত অন্য কোন জাল মৎস্য আহরণে ব্যবহার নিষিদ্ধ এবং একটি অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে যার দন্ড হবে অনধিক ২ বৎসরের কারাদন্ড বা অনধিক ২৫ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড।

২৯। সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা। সরকার সামুদ্রিক জীব বৈচিত্র্য রক্ষায় বিশেষ করে সংকটাপন্ন জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী সংরক্ষণে চিহ্নিত সামুদ্রিক এলাকাকে সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করতে পারে।

৩১। বৈজ্ঞানিক গবেষণার অনুমতি প্রদান।

সামুদ্রিক মৎস্য আইন ২০২০ যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন হবে বলে মৎস্যবিদগণ ধারণা করছে। তবে এই আইন বাস্তবায়ন সরকারের জন্য একটি বড় পরীক্ষা। গভীর সমুদ্রে নৌযান সমূহের গতিবিধি মনিটরিং করার জন্য এখনও আমাদের আধুনিক প্রযুক্তি সংযুক্ত হয়নি। মৎস্য অধিদপ্তরের অধীন সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের জনবল বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তিগণ দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আন্ত-মন্ত্রণালয় সহযোগিণা বৃদ্ধির মাধ্যমে এই আইন এর কার্যকরি বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

৫.২ National plan of action to prevent, deter and eliminate Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing, Bangladesh

অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ রোধে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। IUU fishing সকল অঞ্চলের জন্য সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, এবং উন্নয়নে হুমকিস্বরুপ। বিশ্বের সকল অঞ্চলেই ওটট ভরংযরহম রোধে বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক, রিজিওনাল এবং জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) ইতোমধ্যেই IUU fishing নির্মূলে International Plan of Action (IPOA-IUU) প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের সহযোগীতায় জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (NPOA-IUU) এর খসড়া প্রণয়ন করেছে।

IUU মৎস্য আহরণ এর সংজ্ঞা

অবৈধ মৎস্য আহরণ: যখন কোন মৎস্য নৌযান (স্থানীয়/বিদেশী) কোন রাষ্ট্রের অধীন সমুদ্র অঞ্চলে ঐ রাষ্ট্রের অনুমতি ব্যতিরেকে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত হলে তখন তা অবৈধ মৎস্য আহরণ হিসেবে গণ্য হবে। এ ছাড়াও যখন কোন মৎস্য নৌযান কোন রাষ্ট্রের অধীন মৎস্য আহরণে নিয়োজিত হয়ে যদি উক্ত রাষ্ট্রের অনুমোদিত কোন আইন বা আন্তর্জাতিক কোন আইন লঙ্ঘন করে থাকে তাহলে তা অবৈধ মৎস্য আহরণ হিসেবে গণ্য হবে।

অনুল্লিখিত মৎস্য আহরণ: মৎস্য আহরণে নিয়োজিত কোন নৌযান কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট মৎস্য আহরণের ভুল তথ্য প্রদান বা কোন তথ্য গোপন করলে তা অনুল্লিখিত মৎস্য আহরণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ:

বাংলাদেশের অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ বা IUU ফিশিং এর পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ। মৎস্য অধিদপ্তর এর অত্যন্ত সাহসি পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলেও এখনও টেকসই মৎস্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে বড় বাধা IUU ফিশিং। বাংলাদেশের মোট সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আসে IUU ফিশিং থেকে। অবৈছ জাল ও সরঞ্জামের ব্যবহার, লাইসেন্স বিহীন মৎস্য নৌযান এবং নিষিদ্ধ এলাকায় মৎস্য আহরণ এই অঞ্চলের প্রধান IUU ফিশিং হিসেবে চিহ্নিত।

IUU ফিশিং এর কারণে সরকার কর্তৃক গৃহীত মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের পদক্ষেপসমূহ আশানুরুপ ফল পাচ্ছে না। যার ফলে এখনও আমাদের দেশের বাণিজ্যিক মৎস্য প্রজাতিসমূহের মজুদ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।

বাংলাদেশের গৃহীত National Plan of Action IUU (NPOA-IUU) এর উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ হলো

- **সকল রাষ্ট্রের দায়িত্বাবলি:** এই অংশে বাংলাদেশ কর্তৃক IUU ফিশিং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদ বা চুক্তিতে স্বাক্ষরের বিষয় এবং অস্বাক্ষরিত চুক্তিসমূহের রাষ্ট্রের অবস্থান এবং অতি দ্রুত সকল চুক্তিতে সংযুক্তির বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। IUU ফিশিং রোধে বাংলাদেশ সকল রাষ্ট্রকে পূর্ণ সহযোগিণা করবে এবং আঞ্চলিক সংস্থার মাধ্যমেও প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে কাজ করবে।
- **পতাকাবাহী রাষ্ট্রের দায়িত্বাবলি:** জাতীয় কর্মকৌশলের পতাকাবাহী রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে অবশ্যই তার সকল মৎস্য নৌযানসমূহের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতে হবে এবং তার সঠিক তথ্য রাখতে হবে। সরকার মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রে নৌযানসমূহের লাইসেন্স দিবে এবং মৎস্য আহরণ এর যাবীয় তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে।
- **উপকূলীয় রাষ্ট্রের দায়িত্বাবলি:** বাংলাদেশ তার উপকূলীয় অঞ্চলে IUU ফিশিং রোধে সচেষ্ট হবে এবং IUU ফিশিং এ জড়িত নৌযানসমূহকে উপকূলীয় অঞ্চলে অনুপ্রবেশ রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
- **বন্দর রাষ্ট্রের দায়িত্বাবলি:** NPOA-IUU এর এই অংশে বন্দর রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ যেকোন ধরনের IUU ফিশিং এ জড়িত দেশী ও বিদেশী নৌযানসমূহের নিজ বন্দরে অনুপ্রবেশ বা বন্দর এর ব্যবহারে অসম্মতি প্রকাশ করবে। যদি বিদেশী কোন নৌযান বাংলাদেশে বন্দরে অবস্থানরত অবস্থায় প্রতীয়মান হয় যে তা IUU ফিশিং এর সাথে জড়িত ছিল সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ পতাকাবাহী রাষ্ট্রকে তা জানাবে। আঞ্চলিক সংস্থার মাধ্যমে IUU ফিশিং রোধে বন্দর রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ তার দায়িত্ব পালন করবে।

৫.৩ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সনদ বা চুক্তিতে বাংলাদেশে ইতোমধ্যেই স্বাক্ষর করেছে এবং কিছু চুক্তিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নিম্নে এর তালিকা উল্লেখ করা হল:

আন্তর্জাতিক সনদ বা চুক্তি	বাংলাদেশের অবস্থান
১৯৮২ UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)	স্বাক্ষর করে ২০০১
১৯৯৩ FAO Compliance Agreement	স্বাক্ষর করে নি
১৯৯৫ UN Fish Stocks Agreement	স্বাক্ষর করে ১৯৯৫
২০০১ International Plan of Action – IUU	চলমান
২০০৯ FAO Port State Measures Agreement	স্বাক্ষর কওে ২০১৯
২০১৪ Voluntary guidelines for Flag State Performance	পদক্ষেপ গ্রহণ
২০১৭ Voluntary guidelines for Catch Documentation Scheme	পদক্ষেপ গ্রহণ

আনক্লস (UN Convention on the Law of the Sea- UNCLOS)

আনক্লসকে 'সমুদ্রের সংবিধান' হিসেবে অভিহিত করা হয়। এযাবৎকালের সমুদ্র সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার বিরোধ এই আইনের মাধ্যমেই নিষ্পত্তি করা হয়ে থাকে। বিশ্বের পরাশক্তি রাষ্ট্রসমূহের বিশেষ করে নৌপরাশক্তি রাষ্ট্রসমূহের সমুদ্র দখলদারিত্ব এর বিরূদ্ধে এবং বড় রাষ্ট্রসমুহের কাছ থেকে ছোট রাষ্ট্রসমুহের সমুদ্রে প্রতি যে অধিকার প্রাপ্য তার প্রতিষ্ঠ এবং সমুদ্র এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আনক্লস সনদ বা আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন প্রণয়ন করা হয়। আনক্লস কনভেনশনকে আন্তর্জাতিক আইনসমুহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্বয়ংসম্পূর্ণ আইন হিসেবে মনে করা হয়। র্বুমানে বিশ্বের ১৬৪ টি দেশ এপর্যন্ত এই কনভেনশনে স্বাক্ষরিত রাষ্ট্র। বিগণ ১৯৮২ সালের ১০ ডিসেম্বর আনক্লস ৩ কনভেনশন জাতিসংঘের একটি কনফারেন্সে গৃহীত হয় এবং ১৯৯৪ সাল থেকে এই কনভেনশনটি কার্যকর হয়। বাংলাদেশ ২০০১ সালে আনক্লস কনভেনশনের পক্ষে স্বাক্ষর করে। আনক্লস সনদে ৩২০ টি ধারা/আর্টিকেল এবং ৯ টি এনেক্স/পরিশিষ্ট রয়েছে। উক্ত সনদে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তিকরণসহ, সমুদ্রের পরিবেশ রক্ষা, সমুদ্র বিষয়ক গবেষণা, সমুদ্রে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা পদ্ধতি বিষয়ক নীতিমালা রয়েছে।

বৃহৎ রাষ্টসমূহের সমুদ্রে আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা বহুকাল থেকেই চলছে। যার ফলশ্রুতিতে ভারত মহাসাগরে ভারতের আধিপত্য বিস্তারের কারণে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের ন্যায্য হিস্যা প্রাপ্তির জন্য বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক আদালতের দ্বারস্থ হলে আনক্লস কনভেনশনের মাধ্যমে ভারত ও বাংলাদেশের সমুদ্রসীমানা সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পন্ন করা হয় এবং বাংলাদেশ সমুদ্রে তার ন্যায্য হিস্যা ফিরে পায়। সমুদ্র নিয়ে ভারতের সাথে বাংলাদেশের বিরোধ সুদীর্ঘ ৪০ বছরের পুরাতন। তাই বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার সালিশী রায়ের ফলে ৪০ বছরের বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হয় এবং বাংলাদেশ ফিরে পায় বিরোধপূর্ণ অঞ্চলের ১৯,৪৬৭ বর্গ কি.মি. অঞ্চল। তাই আন্তর্জাতিক অঞ্চলের পাশাপাশি বাংলাদেশের জন্যও এই রায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। সমুদ্র নিয়ে রাষ্ট্রসমূহের বিরোধ নিষ্পত্তির পাশাপাশি আনক্লস এ রয়েছে সমুদ্রে অবস্থিত সকল প্রকার জৈব ও অজৈব সম্পদের সুরক্ষার ভিত্তি।

FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)

প্রাচীনকাল থেকেই মৎস্য আহরণ মানবজাতির একটি উল্লেখযোগ্য পেশা। খাদ্যের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি এই সেক্টর বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের যোগান দিয়ে আসছে। কিন্তু বুর্মানে সামুদ্রিক মাছের বিপুল চাহিদা এবং এই খাত একটি লাভজনক খাত হওয়ায় উপকূলীয় অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে এই খাতে বিনিয়োগ এবং ব্যবসার পরিমাণ আগের থেকে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত নৌযান, জাল সরঞ্জামাদি এবং আহরণ কৌশলের উপর এই বিনিয়োগের ফলে এই খাতের অনেক আধুনিকায়ন হয়েছে এবং অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছে। বুর্মানে তাই বিশেষজ্ঞগণ মনে করছে এভাবে মৎস্য আহরণে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার চলতে থাকলে এই সেক্টর কোনক্রমেই ভবিষ্যতের জন্য টেকসহ হবে না। আর একারণেই মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রে সবাইকেই দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে। এলক্ষ্যেই FAO ১৯৯৫ সালে Code of Conduct for Responsible Fisheries প্রণয়ন করে। আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় উভয় ক্ষেত্রে CCRF কে প্রয়োগ করলে টেকসই মৎস্য উৎপাদন এবং উন্নয়ন সম্ভব হবে। **CCRF** বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে আন্তর্জাতিক কর্মকৌশল গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেগুলি হলো- (১) হাঙ্গর এর প্রজাতিসমূহের সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা, (২) সামুদ্রিক পাখির আকস্মিক আহরণ হ্রাস, (৩) IUU মৎস্য আহরণ হ্রাসকরণ ও নির্মূল, এবং (৪) মৎস্য আহরণ নিয়ন্ত্রণ। যাহোক ২৫ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও CCRF কে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়।

UN Fish Stock Agreement (UNFSA) জাতিসংঘ মাছের মজুদ চুক্তিনামা

বৈশ্বিক সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে বিশ্বের নেুবৃন্দ UN Fish Stock Agreement (UNFSA) জাতিসংঘ মাছের মজুদ চুক্তি গ্রহণ করে। এই চুক্তি ২০০১ সাল থেকে কার্যকর হয়। এই চুক্তির উদ্দেশ্য হল অতি পরিযায়ী মৎস্য প্রজাতি সমূহের দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণ এবং টেকসই আহরণ নিশ্চিতকরণ। এই চুক্তিনামা অতি পরিযায়ী সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু সংরক্ষণের জন্য প্রতিবেশি রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সহযোগীতা বৃদ্ধিকরা, তথ্য আদান প্রদান এর মাধ্যমে আঞ্চলিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার কাঠামো প্রদান করে থাকে। "সকল রাষ্ট্র অতিপরিযায়ী মাছের দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণ ও টেকসই আহরণ নিশ্চিতকরণে একে অপরকে পূর্ণ সহযোগিণা করবে এবং এলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ভাবে যে ব্যবস্থাপনা কৌশল অবলম্বন করা হবে তা মেনে চলবে" এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে এই চুক্তি প্রণয়ন কর হয়। সকল রাষ্ট্র তার EEY এর মধ্যে মৎস্য আহরণে সাবভৌম ক্ষমা প্রয়োগ করে থাকে তাই সেই এলাকার জীব বৈচিত্র্য রক্ষার দায়িত্বও তার উপর। অতি পরিযায়ী মৎস্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সকল রাষ্ট্র একে অপরকে সহযোগীতা করবে।

International Plan of Action IUU (IPOA IUU)

বর্তমানবিশ্বে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় IUU ফিশিং বড় একটি অন্তরায়। সারা বিশ্বের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই উন্নয়ন এর সকল পরিকল্পনা IUU ফিশিং এর কারণে সফলতার মুখ দেখছে না। সারা বিশ্বব্যাপী IUU ফিশিং প্রতিরোধ, কমানো এবং নির্মূলের লক্ষ্যে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা IPOA-IUU প্রণয়ন করে। IPOA-IUU এর গঠন মূলত ১৯৯৫ সালে গৃহীত CCRF এর ওপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে। এর গঠন প্রণালিতে রাষ্ট্র কর্তক বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেমন কিছু বিষয় রয়েছে স্বেচ্ছায় গৃহীত কার্যক্রম আবার কিছু বাধ্যতামূলক চুক্তিও রয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে IPOA IUU এর স্বাক্ষরিত সকল দেশসমূহকে অবশ্যই IUU ফিশিং রোধে জাতীয় কর্মকৌশল প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট হতে হবে। IPOA IUU এর গঠন প্রণালিতে ৪ ধরণের রাষ্ট্রের জন্য কর্মকৌশল পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। পদ্ধতিসমূহ হলো- (১) প্রাথমিক পদক্ষেপ যা সকল ধরনের রাষ্ট্রকে পালন করতে হবে (All State Measures), (২) পতাকাবাহী রাষ্ট্রের দায়িত্ব (Flag State Measures), (৩) উপকূলীয় রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা (Coastal State

Measures), এবং (৪) বন্দর রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ (Port State Measures)। এছাড়াও এই সনদে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে IUU ফিশিং রোধে গৃহীত পদক্ষেপ এবং উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহের IPOA IUU এর বাস্তবায়নের সহযোগীতার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

সামুদ্রিক মাছের প্রধান প্রজনন মৌসুম নির্ধারণ

বিভিন্ন পরিবেশগণ কারনে বছরে একটি নির্দিষ্ট সময়ে মাছ ডিম দেয়। ঐ নির্দিষ্ট সময় যখন মাছের গোনাড সম্পূর্ন পরিপক্কতা লাভ করে ঐ সময়কেই বলে মাছের প্রজনন মৌসম। নবায়নযোগ্য এ সম্পদের সঠিক মাত্রায় আহরণ, সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন প্রায়োগিক ও ধারাবাহিক গবেষণার মাধ্যমে প্রজনন মৌসুম নির্ধারণ। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সুষ্ঠু ও কার্যকর মজুদ ব্যবস্থাপনা ও প্রাচুর্যতা নির্ণয়ে গবেষণা জাহাজের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের পাশাপাশি স্ব-স্বমৎস্য প্রজাতির প্রধান প্রজনন মৌসুম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

৬.১ প্রজনন মৌসুম নির্ধারনের উদ্দেশ্য

মাছের প্রজনন মৌসুম নির্ধারন করার প্রধান কারন হলো প্রতিটি মাছের প্রজননের মাধ্যমে কিশোর মাছের সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা। এছাড়া এটি সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে নিষিদ্ধ সময়ের (Ban period) সুষ্ঠু বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রধান প্রজনন মৌসুমে স্ত্রী মাছের নিরাপদে ডিম দেয়ার সময় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রজনন মৌসুমে মাছ ধরার ফলে মাছের জনসংখ্যা হ্রাস পায়। তাই প্রতিটি প্রজাতির মাছের প্রজনন মৌসুম চিহ্নিতকরণ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ।

গোনাড: গোনাড প্রাথমিক প্রজনন অঙ্গ, পুরুষ মাছের টেস্টিস এবং স্ত্রী মাছের ডিম্বাশয়। এই অঙ্গগুলি শুক্রাণু এবং ওভা উৎপাদন করে। পুরুষ মাছের সাধারণত জোড়া টেস্টিস যা শুক্রানু তৈরি করে এবং স্ত্রী মাছের জোড়া ডিম্বাশয় থাকে যা ডিম তৈরি করে। দুটি লম্বা ফ্যাকাশে অঙ্গ হল টেস্টিস যা পুরুষ গোনাড।

গোনাডের অবস্থান ও কাজ: গোনাড সাধারনু লম্বা ও জোড়াযুক্ত যা পেটের গহবরে, এয়ার ব্লাডারের তলদেশে, পৃষ্ঠীয় প্রাচীরসংলগ্ন এবং পেরিটোনিয়াম দ্বারা বেষ্টিত থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক মাছের গোনাড এর প্রধান কাজ হলো হরমোন উৎপাদন এবং ভ্রুণের বিকাশ, বৃদ্ধি এবং যৌন পরিপক্কতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

লিঙ্গ নির্ধারন: লিঙ্গ নির্ধারন করা অনেক সময় সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। শরীরের গহবরকে উন্মুক্ত করতে হবে। ডিম্বাশয় সাধারনু লম্বা, হলুদ বর্ণের ও দানাদার হয় এবং টেস্টিস সাদা ও চ্যাপ্টাকৃতির হয়। ডিম্বাশয়ের তুলনায় টেস্টিস বেশী চ্যাপ্টাকৃতির হয়।

মাছের গোনাডের পরিপক্কতা নির্নয়: মাছের গোনাডের পরিপক্কতা বলতে পুরুষ ও স্ত্রী মাছের ডিম্বাশয় ও শুক্রাশয়ের পরিপক্কতার মাত্রা বুঝায়। আকৃতি, আকার ও রঙের ভিত্তিতে এবং অন্যান্য হিস্টো-মর্ফোলজিকাল বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে গোনাডের পরিপক্কতার ধারনা করা হয়। কিন্তু ভিজ্যুয়াল এর ভিত্তিতে গোনাডের পরিপক্কতার ধারনা স্পষ্ট হয় না।

ডিম্বাশয়ের আকৃতি, আকার, রঙের ভিত্তিতে এবং অন্যান্য হিস্টোমর্ফোলজিকাল বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে ছয়টি পরিপক্কতার ধরন চিহ্নিত করা হয় এবং এগুলি হলো-

ক) Resting phase (immature): ডিম্বাশয় ছোট, পাতলা ও অস্বচ্ছ এবং শরীরের গহবরে কেবলমাত্র একটি ছোট অংশ দখল করে এবং ডিম্বাশয় খালি চোখে দেখা যায় না।

খ) Earlz maturing phase: ডিম্বাশয়গুলো কিছুটা বড়, ঘন, অস্বচ্ছ হয় এবং হালকা হলুদ বর্ণ ধারন করে। ডিম্বাশয়ের ওজন বৃদ্ধি পায় এবং তারা শরীরের গহবরে প্রায় অর্ধেক অংশ দখল করে।

গ) Advanced maturing phase: ডিম্বাশয়ের ওজন এবং আয়তন আরও বৃদ্ধি পায় এবং ডিম্বাশয় হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং শরীরের গহ্বরের ২/৩ থেকে ৩/৪ অংশ দখল করে।

ঘ) Mature or pre-spawning phase: ডিম্বাশয়গুলো আরও বৃদ্ধি পায় এবং প্রায় পুরো শরীরের গহ্বর দখল করে। এগুলি দুর্গন্ধযুক্ত, ডিম্বাশয় হলুদ বর্ণের এবং পাতলা ডিম্বাশয়ের প্রাচীরের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে গোলাকার ওভা খালি চোখে দৃশ্যমান।

ঙ) Spawning phase: ওভারি খুব বেশি বৃদ্ধি পায় যা পুরো শরীরের গহ্বর দখল করে। ডিম দুর্গন্ধযুক্ত এবং হলুদ বর্ণের হয়। ডিম্বাশয়ের প্রাচীরটি খুব পাতলা, প্রায় স্বচ্ছ থাকে। ডিম্বাশয়ে ডিম্বাণুও উপস্থিত থাকে।

চ) Spent phase: ডিম্বাশয় সঙ্কুচিত হয় এবং খালি থলের মতো আকার ধারন করে এবং এগুলি নিস্তেজ বর্ণ ধারণ করে।

পাশাপাশি শুক্রাশয়ের আকৃতি, আকার, রঙের ভিত্তিতে এবং অন্যান্য হিস্টো-মর্ফোলজিকাল বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে পরিপক্কতার ধরণ চিহ্নিত করা হয় এবং এগুলি হলো-

ক) Immature: টেস্টিস ছোট, স্বচ্ছ,লম্বা পাতলা স্ট্রিপগুলি ভার্টিব্রাল কলামের নিকটে অবস্থিত থাকে।

খ) Maturing: টেস্টিস সাদাটে, খালি চোখে দেখা যায় এবং বডি ক্যাভিটির ১/৪ ভাগ অংশ দখল করে।

গ) Mature: টেস্টিস বড়, খালি চোখে সহজে দেখা যায়, গোনাড কাটলে শুক্রাশয়ের ফোটা দেখা যায়।

ঘ) Spent phase: টেস্টিস সঙ্কুচিত হয় এবং অমলীন সাদা বর্ণ ধারন করে।

মাছ মৌসুমী প্রজননকারী প্রজাতি যা বছরের নির্দিষ্ট সময়ে প্রজনন করে যার জন্য আমাদের ঐ নির্দিষ্ট সময় জানা জরুরী। ডিম্বাশয় ও শুক্রাশয়ের বৃদ্ধি থেকে ডিম ও শুক্রানু চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত চক্রের সময়কাল জেনে ব্রিডিং সিজন নির্ধারণ করার জন্য সেক্স রেসিও (Sex Ratio) নির্ধারণ এবং বছরের কোন নির্দিষ্ট সময় মাছের পরিপক্কতার পর্যায় তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানা এবং সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যথষ্টে গুরুত্বপূর্ণ। স্টক মুল্যায়নের জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য প্রজাতির সেক্স রেসিও নির্ধারণ এবং পরিপক্কতার (Maturity Stage) সময় জানা খুবই জরুরী।

পরিপক্ক মাছের ওভারির ব্যাস পরিমাপের মাধ্যমে এবং প্রজাতির গোনাডোসোমাটিক ইনডেক্স এর মাধ্যমে মাছের প্রজনন মৌসুমের ধারনা এবং পরিপক্কতা নির্ধারন করা যায়। তবে এ ক্ষেত্রে মৎস্য প্রজাতির গোনাডোসোমাটিক ইনডেক্স ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। আর তাই সামুদ্রিক মৎস্যবিজ্ঞানী ও গবেষকদের পরামর্শে সাগরে মাছের মজুদ ব্যবস্থাপনাকে আরো সঠিকভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রামে স্থাপিত 'ফিশারিজ বায়োলজি ল্যাব' এর মাধ্যমে সামুদ্রিক মাছের প্রধান প্রজনন মৌসুম নির্ধারণে GSI (Gonado Somatic Index) ও গোনাডাল হিস্টোলজি সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাগণ এবং সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে এই ল্যাবের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

৬.২ কার্যপদ্ধতিঃ

নমুনা নির্বাচন: সামুদ্রিক ও উপকূলীয় এলাকা থেকে বর্তমানে ১০০ টিরও বেশি প্রজাতির মাছ বাণিজ্যিকভাবে আহরণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বসম্পন্ন সামুদ্রিক মাছের প্রজনন মৌসুম নির্ণয়ে অপ্রতুল কাজ হয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও মাছ ধরার বন্ধ মৌসুম সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য মাছের প্রধান প্রজনন মৌসুম নির্ণয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিকভাবে গবেষণাগারে কর্মরত জনবলের কথা বিবেচনা করে প্রথম বছরের জন্য বাণিজ্যিকভাবে আহরিত মাছের প্রজাতির মধ্য থেকে ৫টি প্রজাতিকে নমুনা হিসেবে বাছাই করা হয়। গবেষণার জন্য বাছাইকৃত মাছের প্রজাতিগুলো হলো- (১) লালপোয়া (*Chrzsochir aureus*), (২) ফলিচান্দা (*Pampus argenteus*), (৩) মাখনচান্দা (*Ariomma indicum*), (৪) আইলা (*Rastrelliger kanagurta*), ও (৫) লইট্টা (*Harpadon nehereus*)।

নমুনা সংগ্রহ: মাছের প্রধান প্রজনন মৌসুম সম্পর্কে অধ্যয়ণ করতে যে কোন একটি প্রজাতির কমপক্ষে ১২ (বার) মাসের জন্য মাস ভিত্তিক নমুনার প্রয়োজন হয়। এ গবেষণায় নমুনা সংগ্রহ করতে চট্টগ্রামের সবচেয়ে ব্যস্ততম ও বিস্তৃত পরিধির মৎস্য অবুরণ কেন্দ্র ও পাইকারী বাজার ফিশারি ঘাটকে বেছে নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে প্রতি মাসে সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাগণ মাস ভিত্তিক দৈবচয়ণ নমুনায়নের (Random Sampling) ভিত্তিতে মাছের নমুনা সংগ্রহ করেন। বিগণ ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে শুরু করে জানুয়ারি ২০২০ সাল পর্যন্ত মাছের প্রাপ্যতা সাপেক্ষে নমুনা সংগ্রহ করা হয়। মোট বার মাসের নমুনায়নে প্রতি মাসে প্রত্যেক প্রজাতির প্রায় ১০০টি করে নমুনা সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণ করা হয়।

মাছের গোনাড সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: মাছের নমুনা সংগ্রহের পর তা সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের গবেষণাগারে নিয়ে এসে ইউনিটের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাগণ মাছের পেট কেটে (Abdominal Cavitz) তার গোনাড (Ovary/Testis) সংগ্রহ করেন। এসময় GSI (Gonado Somatic Index) সংক্রান্ত গবেষণার জন্য মাছের বিভিন্ন অংগের দৈর্ঘ্য, ওজন এবং গোনাডের ওজন নেওয়া হয়।

এসকল তথ্য উপাত্ত একটি নির্ধারিত ছক ভিত্তিক ফরমে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং পরবর্তীতে তা কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হয়। টিস্যুর তাত্ত্বিক গবেষণার (Histological Analzsis) জন্য পরবর্তীতে নমুনাকৃত মাছের মধ্য থেকে স্ত্রী ও পুরুষ মাছের গোনাড নির্দিষ্ট লেবেলকৃত ভায়ালে ১০% ফরমালিন দ্রবণে সংরক্ষণ করা হয়। GSI (Gonado Somatic Index) মুলত মাছের গোনাডের ওজনের সাথে তার শরীরের ওজনের একটি সম্পর্ক। যা নিম্নের সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

$$GSI = \frac{\text{গোনাডের ভর (ওজন)}}{\text{মাছের ভর (ওজন)}} \times ১০০$$

GSI এর মান বা সূচকের মাধ্যমে মাছের গোনাডের পরিপক্কতার একটি ধারণা পাওয়া সম্ভব, কারণ প্রজনন মৌসুমে সাধারণত মাছের এঝও এর মান সর্বোচ্চ হয়ে থাকে। অর্থাৎ, যে সময়ে কোন একটি নির্দিষ্ট মাছের প্রজাতির জিএসআই মান সর্বাধিক হয়ে থাকে, সেই সময়টিই ঐ মাছের প্রধান প্রজনন মৌসুম হিসেবে গণ্য করা হয়।

চিত্র-১: মাছের গোনাড সংগ্রহ এবং মাছের দৈর্ঘ্য ও ওজনের ডাটা সংগ্রহ

Histological গবেষণার ধাপসমূহঃ Histological Analzsis মুলতঃ একটি লম্বা সিরিজের রাসায়নিক দ্রবণ সমুহের মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রেখে গোনাড টিস্যুকে সর্বশেষে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে পর্যবেক্ষণের জন্য প্রস্তুত করা। এর মাধ্যমে গোনাড টিস্যুও আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন উপাদান পর্যবেক্ষণ করে তার বিভিন্ন পর্যায় নির্ণয় করার মাধ্যমে মাছের প্রধান প্রজনন মৌসুম নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। এই গবেষণায় এখানে অত্যাধুনিক অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়াও মাইক্রোটম মেশিন, হট-ওয়াটার বাথ, হট-প্লেট, মাইক্রোওভেনসহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়।

চিত্র-২: গোনাড টিস্যুর Sectioning এবং মাইক্রোটম মেশিনে Sectioning এ প্রাপ্ত রিবন

চিত্র-৩: টিস্যু Staining এবং টিস্যুর অনুবীক্ষনিক পর্যবেক্ষণ

৬.৩ গবেষণায় প্রাপ্ত জিএসআই ও হিস্টোলজি বিশ্লেষণ ভিত্তিক ফলাফলঃ

১। লালপোয়া (*Chrzsochir aureus*): লালপোয়া মাছের বার মাসের নমুনা সংগ্রহ করে তার জিএসআই তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, পোয়া মাছের দুটি প্রজনন মৌসুম রয়েছে; তা হচ্ছে এপ্রিল থেকে জুন ও নভেম্বর-ডিসেম্বর (চিত্র-৭)। উক্ত প্রজনন মৌসুম সমূহের মধ্যে মে ও ডিসেম্বর মাসে সর্বোচ্চ প্রজনন পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও সারা বছরই প্রাপ্ত বয়স্ক ও বড় আকারের মাছের পেটে কম-বেশি ডিম পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, পোয়া মাছের উপর পার্শ্ববর্তী দেশ সমুহের পরিচালিত গবেষণার ফলাফলেও কাছাকাছি/অনুরূপ ফলাফল পাওয়া যায়।

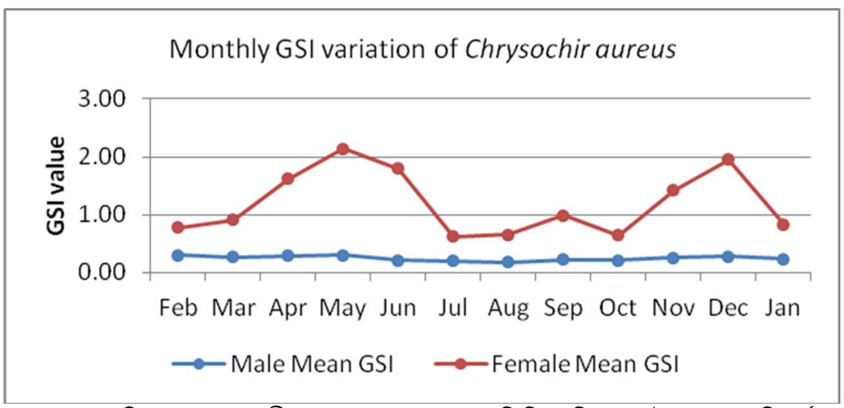

চিত্র-৭: বছরব্যাপী লালপোয়া মাছের মাসভিত্তিক জিএসআই মানের পরিবর্তন

উক্ত পরীক্ষার পাশাপাশি লালপোয়া মাছের বার মাসের গোনাডের (Ovary/Testis) নমুনা সংগ্রহ করে তার Histological তথ্য-উপাত্তের অনুবীক্ষনিক (Microscopic) বিশ্লেষণে জানুয়ারি থেকে মার্চ এবং জুলাই থেকে অক্টোবর মাসসমুহে অপরিপক্ক বা Immature stage এর (চিত্র-৮) ডিম বেশি পাওয়া যায়। এছাড়া এপ্রিল এবং নভেম্বর মাসে আধা-পরিপক্ক বা Developing stage (চিত্র-৯) এর এবং মে-জুন ও নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে পরিপক্ক বা Mature stage (চিত্র-১০) ডিম পাওয়া যায়, যা প্রমাণ করে লালপোয়া মাছের দুটি প্রধান প্রজনন মৌসুম রয়েছে আর তা হলো মে-জুন এবং নভেম্বর-ডিসেম্বর।

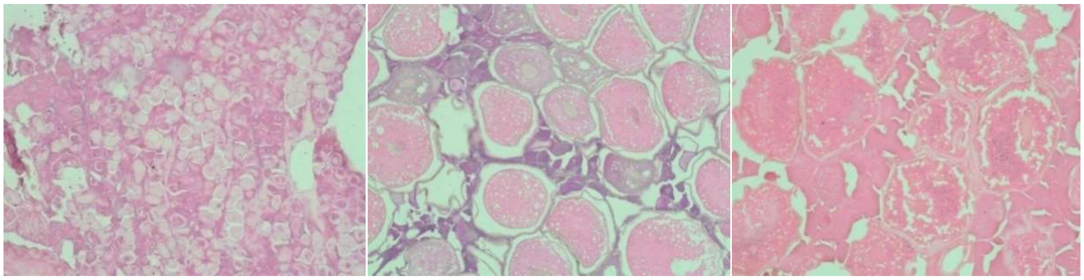

চিত্র- ৫: অপরিপক্ক ডিম (জুলাই), আধাপরিপক্ক ডিম (সেপ্টেম্বর) এবং পরিপক্ক ডিম (ডিসেম্বর)

২। ফলিচান্দা (*Pampus argenteus*): ফলিচান্দা মাছের বার মাসের নমুনা সংগ্রহ করে তার জিএসআই তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ফলিচান্দা মাছের প্রজনন মৌসুম বেশ প্রলম্বিত অর্থাৎ মার্চ থেকে শুরু করে আগস্ট পর্যন্ত বিস্তৃত (চিত্র-৬)। তবে এপ্রিল মাসে এ মাছ সর্বোচ্চ পরিমাণ প্রজননে অংশগ্রহন করে থাকে।

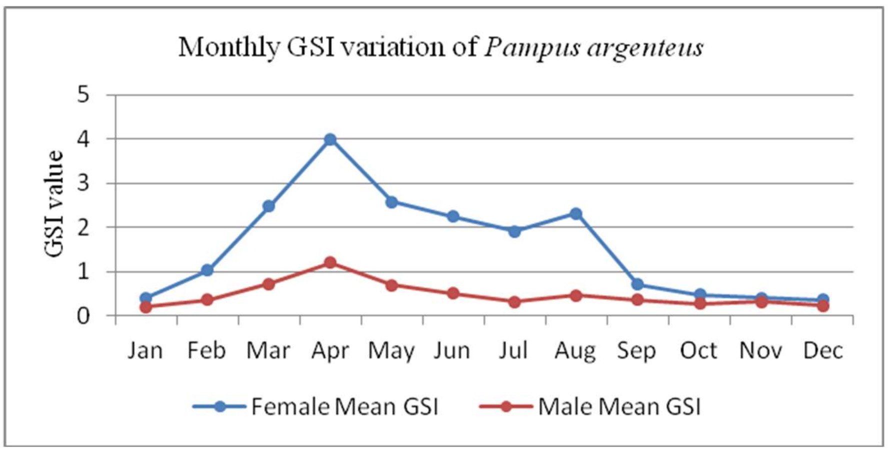

চিত্র-৬: বছরব্যাপী ফলিচান্দা মাছের মাস ভিত্তিক জিএসআই মানের পরিবর্তন

উক্ত ফলাফলের পাশাপাশি ফলিচান্দা মাছের বার মাসের গোনাডের (Ovary/Testis) নমুনা সংগ্রহ করে তার Histological তথ্য-উপাত্ত অনুবীক্ষনিক (Microscopic) বিশ্লেষণে সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মাসসমুহে অপরিপক্ক বা Immature stage এর ডিম বেশি পাওয়া গেছে, এছাড়া মার্চ মাসে আধা-পরিপক্ক বা Developing stage এবং এপ্রিল থেকে আগস্ট পর্যন্ত মাসসমুহে পরিপক্ক বা Mature stage এর ডিম পাওয়া যায় (চিত্র-৭)। যা প্রমাণ করে ফলিচান্দা মাছের প্রজনন মৌসুম মার্চ থেকে আগস্ট পর্যন্ত প্রলম্বিত।

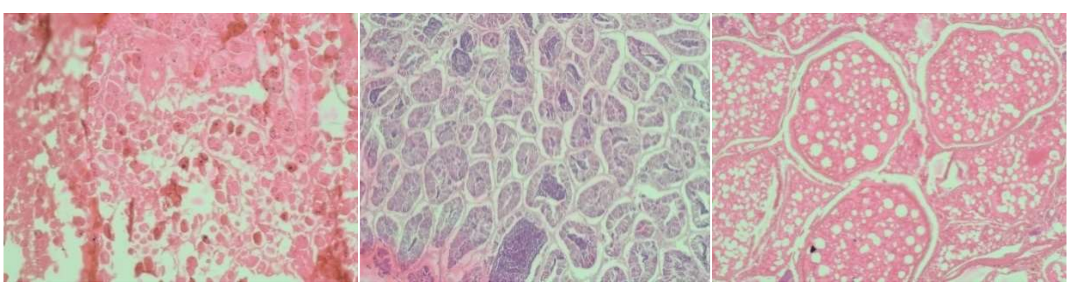

চিত্র-৭: অপরিপক্ক ডিম (জানুয়ারি), আধা অপরিপক্ক ডিম (মার্চ), এবং পরিপক্ক ডিম (এপ্রিল)

৩। **মাখনচান্দা (*Ariomma indicum*)**: মাখনচান্দা মাছের বছর ব্যাপী নমুনা সংগ্রহ করে তার জিএসআই তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে এ মাছের একটি প্রধান প্রজনন মৌসুম রয়েছে; তা হচ্ছে নভেম্বর-এপ্রিল (চিত্র-৮)। এসময়ের মধ্যে ফেব্রুয়ারি মাসে সর্বোচ্চ জিএসআই মান পাওয়া যায়, অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি মাসে এ মাছের সর্বোচ্চ প্রজনন (Peak Spawning) হয়ে থাকে। উলেখ্য, প্রতিবেশী দেশ ভারতের গবেষণায় এ মাছের প্রধান প্রজনন মৌসুম জানুয়ারি হতে মে এবং সর্বোচ্চ প্রজনন ফেব্রুয়ারি মাসে পরিলক্ষিত হয়।

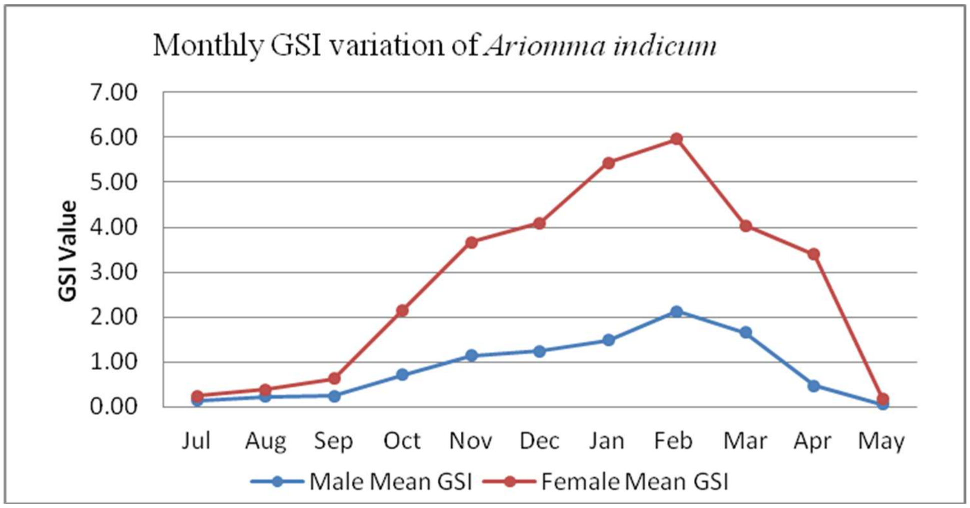

চিত্র-৮: বছরব্যাপী মাখনচান্দা মাছের মাসভিত্তিক জিএসআই মানের পরিবর্তন

অপরদিকে মাখনচান্দা মাছের বার মাসের গোনাডের (Ovary/Testis) নমুনা সংগ্রহ করে তার Histological তথ্য-উপাত্ত অনুবীক্ষনিক (Microscopic) বিশ্লেষণে মে থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত মাস সমুহে অপরিপক্ক বা Immature stage এর ডিম বেশি দেখা গেছে, মার্চ-এপ্রিল এবং নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে আধা-পরিপক্ক বা Developing stage এর এবং জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে পরিপক্ক বা Mature stage এর ডিম পাওয়া যায় (চিত্র-৯), অর্থাৎ মাখনচান্দা মাছের প্রধান প্রজনন মৌসুম জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাস।

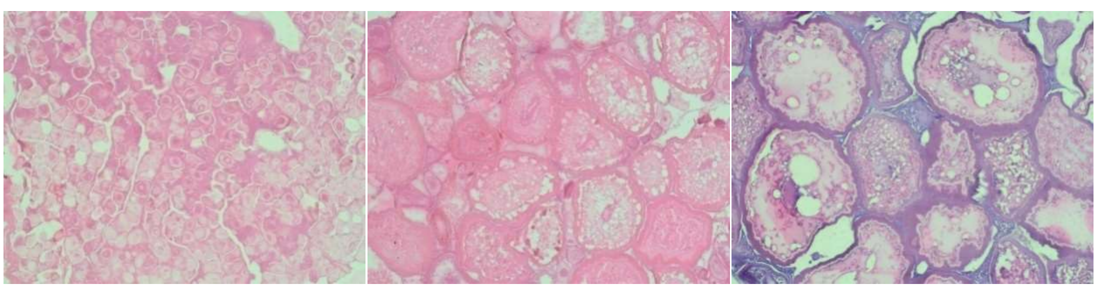

চিত্র-৯: অপরিপক্ক ডিম (আগস্ট), আধা অপরিপক্ক ডিম (নভেম্বর), এবং পরিপক্ক ডিম (ফেব্রুয়ারি)

৪) **আইলা (*Rastrelliger kanagurta*)**: আইলা মাছের বার মাসের নমুনা সংগ্রহ করে তার জিএসআই তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, আইলা মাছের প্রজনন মৌসুম খুবই প্রলম্বিত এবং তা আগস্ট থেকে মার্চ পর্যন্ত বিস্তৃত (চিত্র-১০)। অর্থাৎ প্রায় সারা বছরই এ মাছ প্রজননে অংশগ্রহণ করে থাকে। তবে এ মাছের প্রধান প্রজনন মৌসুম হচ্ছে ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ মাস। এছাড়া আইলা মাছের উপর পরিচালিত অন্যান্য গবেষণা ফলাফলেও কাছাকাছি বা অনুরূপ চিত্র পাওয়া যায়।

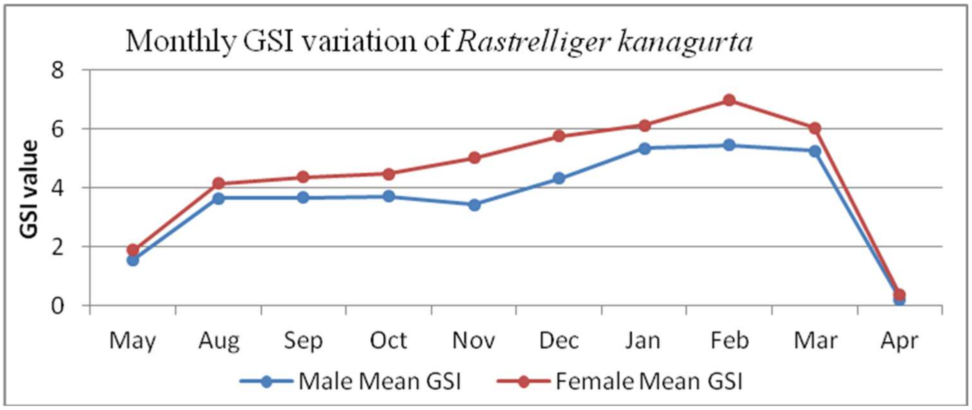

চিত্র-১১: বছরব্যাপী আইলা মাছের মাসভিত্তিক জিএসআই মানের পরিবর্তন

অপরদিকে, আইলা মাছের বার মাসের গোনাডের (Ovary/Testis) নমুনা সংগ্রহ করে তার Histological তথ্য-উপাত্ত অনুবীক্ষনিক (Microscopic) বিশ্লেষণে এপ্রিল মাসে অপরিপক্ক বা Immature stage এর ডিম বেশি পাওয়া যায়, মে থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত মাসসমূহে একই সাথে আধা-পরিপক্ক বা Developing stage ও পরিপক্ক বা Mature stage এর ডিম দেখা গেছে। অন্যদিকে, ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে পরিপক্ক বা Mature stage এর ডিম বেশি পাওয়া যায় (চিত্র-১২), যা প্রমাণ করে আইলা মাছের প্রধান প্রজনন মৌসুম হলো ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস।

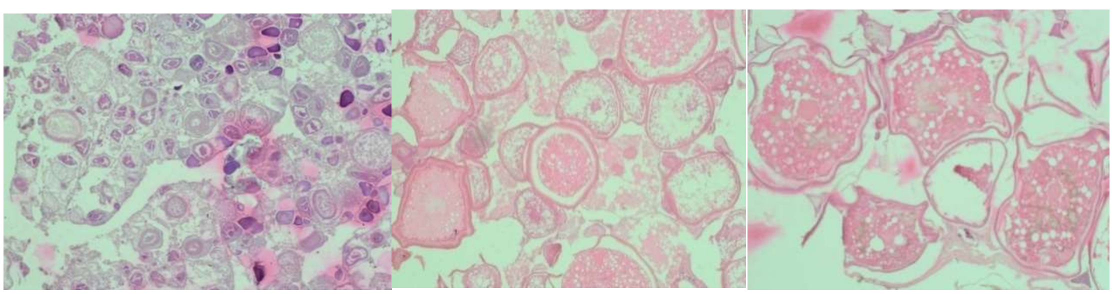

চিত্র-১২: অপরিপক্ক ডিম (এপ্রিল), আধা অপরিপক্ক ডিম (নভেম্বর), এবং পরিপক্ক ডিম (মার্চ)

৫। লইট্টা (*Harpadon nehereus*): লইট্টা মাছের বার মাসের নমুনা সংগ্রহ করে তার জিএসআই তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এ মাছ বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রজননে অংশগ্রহণ করে থাকে; আর তা হলো ফেব্রুয়ারি-মার্চ (চিত্র-১৩)। এছাড়া লইট্টা মাছের উপর পরিচালিত অন্যান্য গবেষণা সমুহের ফলাফলেও কাছাকাছি বা অনুরূপ ফলাফল পরিলক্ষিত হয়।

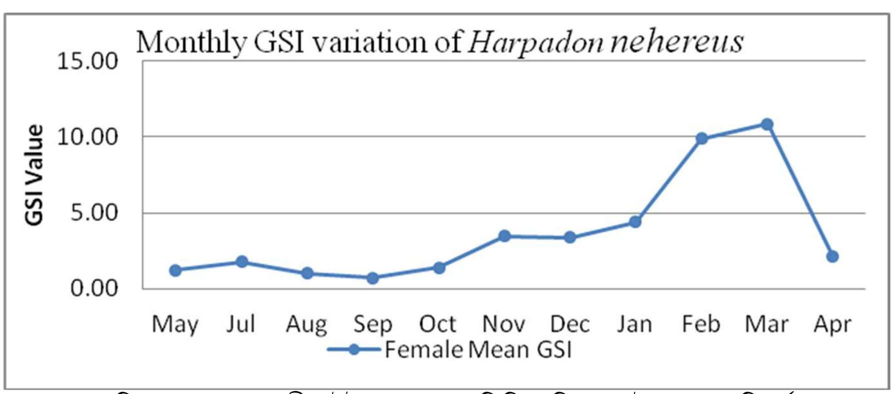

চিত্র- ১৩: বছরব্যাপী লইট্টা মাছের মাসভিত্তিক জিএসআই মানের পরিবর্তন

অপরদিকে, লইট্টা মাছের বার মাসের গোনাডের (Ovary/Testis) নমুনা সংগ্রহ করে তার Histological তথ্য-উপাত্ত আনুবীক্ষনিক (Microscopic) বিশ্লেষণে এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত মাস সমূহে অপরিপক্ক বা Immature stage এর ডিম বেশি দেখা যায়, নভেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত মাসে আধা-পরিপক্ক বা Developing stage এবং ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে পরিপক্ক বা Mature stage (চিত্র-১৪) এর ডিম পাওয়া যায়, অর্থাৎ লইট্টা মাছের প্রধান প্রজনন মৌসুম ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস।

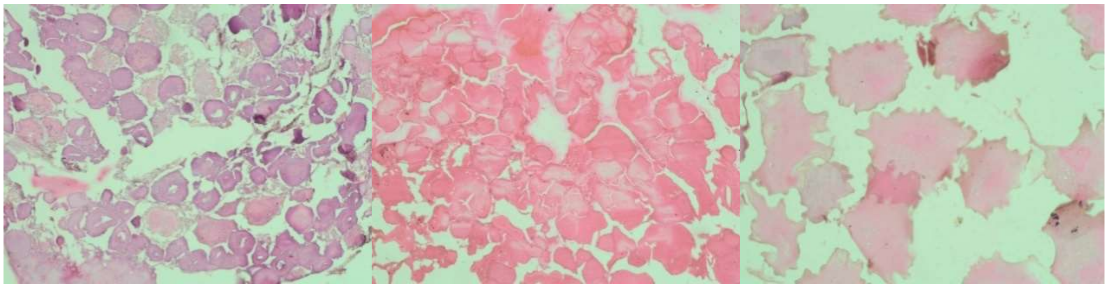

চিত্র-১৪: অপরিপক্ক ডিম (সেপ্টেম্বর), আধা অপরিপক্ক ডিম (ডিসেম্বর), এবং পরিপক্ক ডিম (মার্চ)

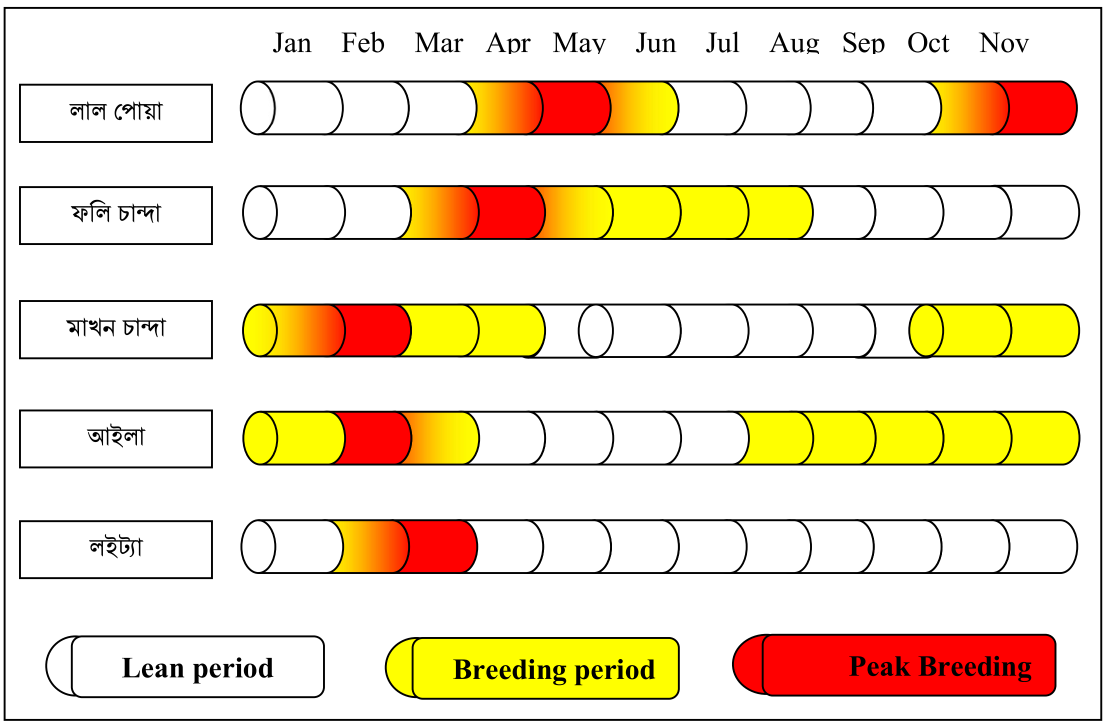

চিত্র- ১৫: এক নজরে ৫টি প্রজাতির বছরব্যাপী প্রজনন মৌসুমের অবস্থান

উপসংহার: সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ও কার্যকর মজুদ ব্যবস্থাপনা এবং প্রাচুর্যতা নির্ণয়ে প্রধান প্রজনন মৌসুম বিষয়ে গবেষণা নিঃসন্দেহে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ দিক বিবেচনায় অত্র গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতি তথা- লালপোয়া, ফলিচান্দা, মাখনচান্দা, আইলা ও লইট্টা মাছের মজুদ ব্যবস্থাপনা সহ সার্বিক ব্যবস্থাপনায় কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া পর্যায়ক্রমে বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন অন্যান্য মৎস্য প্রজাতি সমুহের জন্যও এ ধরনের গবেষণা কাজের মাধ্যমে সার্বিকভাবে সমুদ্রের মৎস্য সম্পদের আধুনিক ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

বঙ্গোপসাগরের মৎস্যসম্পদ এর টেকসই ও সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে সাসটেইনেবল কোস্টাল এ্যান্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্প

বঙ্গোপসাগর জনসংখ্যাবহুল বাংলাদেশের এক বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদ যেটি কক্সবাজার জেলার দক্ষিণ-পূর্ব টেকনাফ হতে সাতক্ষীরা জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম শ্যামনগর পর্যন্ত বিস্তৃত। আমাদের সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং উৎপাদনশীলতায় বিশ্বের ৬৮টি লার্জ মেরিন ইকোসিস্টেমের মধ্যে অন্যতম। অসীম সম্ভাবনাময় আমাদের সমুদ্র সম্পদের সর্বোচ্চ ও সহনশীল ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ ও দৃঢ় পদক্ষেপের ফলশ্রুতিতে ঐতিহাসিক সমুদ্র বিজয়ের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের ১,১৮,৮১৩ বর্গ কি.মি. সামুদ্রিক জলাশয়ে তলদেশীয় ও ভাসমান মৎস্য আহরণে এক নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে বর্তমানসরকার আমাদের সমুদ্রসীমায় গবেষণা ও জরিপ কাজ পরিচালনার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার মাছের মজুদ নির্ণয় এবং মৎস্য আহরণক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ ও সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণ মাত্রা নির্ধারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিশাল সমুদ্র এলাকার মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং বিজ্ঞানসম্মত সহনশীল পর্যায়ে আহরণ নিশ্চিত করে মাছের বংশবৃদ্ধি ও মজুদ ঠিক রেখে যুগ যুগ ধরে সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন অব্যাহত রেখে প্রাণিজ আমিষের যোগান দেয়া ছাড়াও এ মৎস্যসম্পদ বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এর মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। এজন্য সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাস্তবসম্মত এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন অপরিহার্য।

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সুনীল অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু বঙ্গোপসাগরের চিহ্নিত ৪টি মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র ও অদূরবর্তী অগভীর উপকূল ব্যতীত গভীর সমুদ্রে ও আর্ন্তজাতিক সমুদ্রসীমায় অদ্যাবধি কোন প্রকার মৎস্যসম্পদ আহরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। ভিশন ২০৪১ এবং বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) সামুদ্রিক ফিশারিজ কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি জাতিসংঘ ঘোষিত সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (SDG) ২০৩০ অর্জনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিণায় “সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ” নামক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত ৫ বৎসর মেয়াদী সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্পটি কার্যক্রম দেশের উপকূলীয় ১৬টি জেলার ৭৫ টি উপজেলার ৭৫০টি ইউনিয়নে চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, পুষ্টি তথা প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি হ্রাস এবং প্রান্তিক জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নে মৎস্যজীবীদের নিয়ে মৎস্যগ্রাম সমিতি গঠন ও ঋণ সহায়তায় প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবেশবান্ধব ও জলবায়ু সহনশীল প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নিবিড় চাষ পদ্ধতি চালু করে চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধিতে ক্লাস্টার ফার্মিং পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। তাছাড়া সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় মৎস্য সম্পদের টেকসই সংরক্ষণ ও উন্নয়নে এমসিএস (MCS) জোরদার করা হবে।

৭.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

ক. বঙ্গোপসাগরের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে (EEY) জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে চিংড়ি, তলদেশীয় এবং ভাসমান প্রজাতির মৎস্যের মজুদ নিরূপন কর্মসূচি জোরদারকরণ;

খ. সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং গবেষণা সংস্থার সামর্থ্য বৃদ্ধিপূর্বক বিজ্ঞানভিত্তিক টেকসই মৎস্য মজুদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;

গ. বাণিজ্যিক ও ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে অধিকতর কার্যকর পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারী (MCS) পদ্ধতির বাস্তবায়ন;

ঘ. উপকূলীয় অঞ্চলের মৎস্য অবুরণ কেন্দ্র, সার্ভিস সেন্টার, মৎস্যবাজার উন্নয়ন করতঃ আহরিত ও উৎপাদিত মৎস্যের ভ্যালু চেইন উৎকর্ষ ও গুণগণমান উন্নয়ন ও অপচয় হ্রাস করা;

ঙ. উপকূলীয় জেলাসমূহে ক্লাস্টার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সম্প্রসারণ ঘটিয়ে বাগদা চিংড়ির উৎপাদনশীলতা ও চিংড়ি রপ্তানি বৃদ্ধি করা;

চ. দরিদ্র মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠি চালিত Community Driven Development এর সহায়তায় তাঁদের নেতৃত্বে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ-এর টেকসই সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা এবং বিকল্প জীবিকায়নে সহায়তা করা;

ছ. উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ এর টেকসই আহরণ ব্যবস্থাপনায় 'সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা' প্রণয়ন করা; এবং

জ. উপকূলীয় এবং সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংক্রান্ত বিভিন্ন ক্রসকাটিং ইস্যুর ওপর সমীক্ষা পরিচালনা করা।

৭.২ প্রকল্পের কার্যক্রমঃ

বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদের মজুদ ব্যবস্থাপনা, প্রজাতির প্রাপতা, মৎস্য আহরণ ক্রমধারা, পরিবেশ ও প্রতিবেশের বর্তমানঅবস্থা এবং মৎস্যজীবীদের জীবনমান বিবেচনায় নিয়ে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই মৎস্য আহরণ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্রকল্পের সামগ্রিক কার্যক্রম ৪ টি কম্পোনেন্ট এ বিভক্ত করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং সেগুলি হলো-

কমপোনেন্ট-০১ঃ মৎস্য খাতে টেকশই বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষমুা বৃদ্ধি

এ কম্পোনেন্টের আওতায় সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্যের মজুদ নিরূপণে ল্যান্ডবেইজড জরিপ কার্যক্রম বাস্তবায়নে উপকূলীয় মৎস্য অবুরণকেন্দ্রের তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক এর বিপরীতে ১৯৫ জন তথ্য সংগ্রহকারী বা এক্সটেনশন এজেন্ট (এনুমারেটর) নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। পাশাপশি গভীর সমুদ্রের তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের গবেষণা ও জরিপ জাহাজ "আর. ভি. মীন সন্ধানী" দ্বারা ভেসেল বেইজড জরিপ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বাণিজ্যিক ট্রলারের মৎস্য আহরণ কার্যক্রম তদারকির জন্য ১০০টি বাণিজ্যিক ট্রলারে ভ্যাসেল মনিটরিং সিস্টেম (VMS) স্থাপন করে মনিটরিংকে জোরদার করা, আর্টিসনাল মৎস্যজীবী বা জেলেদের সকল প্রকার ঝুঁকি হ্রাসকরণে ১০,০০০ টি যান্ত্রিক নৌকায় AIS (Automatic Identification System) সংযোগ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় নিয়মি Monitoring Control & Surveillance (MCS) জোরদার করার জন্য ১৬ টি মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট স্থাপনপূর্বক ১৬টি হাইস্পীড পেট্রোল বোট ক্রয় করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এছাড়াও এ কমপোনেন্টের আওতায় হাইড্রোলজিক্যাল সার্ভে, স্যালানাইজেশন ম্যাপিং ও ভ্যালু চেইন ম্যাপিং এবং এণৎসংক্রান্ত ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টিকরণে কাজ করা হচ্ছে। চিংড়ি উৎপাদনে ক্লাস্টার ব্যবস্থা (৬০০টি, ১৫,০০০ জন প্রান্তিক চিংড়ি চাষি) চালুকরণ ও কন্ডিশনাল ম্যাচিং গ্রান্ট প্রদানসহ ক্লাস্টার বিজনেস প্লান তৈরি ও ই-ট্রেসিবিলিটি উন্নয়ন, ডাটা বেইজ তৈরী এবং সমুদ্র ও উপকূলীয় জেলেদের আইডি কার্ড প্রদানের সংস্থান রাখা হয়েছে। এ কম্পোনেন্টের আওতায় উল্লিখিত কার্যক্রমগুলো প্রকল্পের মাধ্যমে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করে উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের জীবনমান উন্নয়ন, মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন ও টেকসই আহরণ অর্জন নিশ্চিত হবে।

কমপোনেন্ট-০২ঃ অবকাঠামোগণ ও উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নয়নঃ

মৎস্য খাতে টেকশই বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধি অর্জনে প্রকল্পের সহায়তায় অবকাঠামোগণ ও উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নয়ন অতীব গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। সে প্রেক্ষিতে ১৬টি মেরিন ফিশারিজ সার্ভিল্যান্স চেকপোস্ট স্থাপন ও পন্টুন নির্মাণ; ১৮টি ফিশ ল্যান্ডিং সেন্টার/ফিশ হারবার নির্মাণ বা ফিশ মার্কেট পুনবার্সন ও আধুনিকায়ন, ৩টি ফিশ কোয়ারেন্টাইন ল্যাবরেটরি, ৩টি ফিশ ডায়াগোনোস্টিক ল্যাবরেটরি, ৩টি পিসিআর ল্যাবরেটরি নবায়ন/আধুনিকায়ন, ১টি Quarantine রেফারেন্স ল্যাবরেটরি, ১ টি ব্রুড (মা-চিংড়ি মাছ) ম্যানেজম্যান্ট সেন্টার (BMC) এবং ১২৯টি উপকূলীয় খাল (৫০০ হেক্টর) পুনবার্সন/খননের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

মেরিন ফিশারিজ সার্ভিল্যান্স চেকপোস্ট ও পন্টুন ও হাইস্পীড বোটের সহায়তায় Monitoring, Control & Surveillance (MCS) জোরদার করা, ফিশ ল্যান্ডিং সেন্টার/ফিশ হারবার নির্মাণ বা ফিশ মার্কেট পুনবার্সন ও আধুনিকায়ন করে আহরিত মাছের পোস্ট হার্ভেস্ট ক্ষতি হ্রাস, ফিশ কোয়ারেন্টাইন, ফিশ ডায়াগোনোস্টিক ও পিসিআর ল্যাবরেটরি ও ব্রুড ম্যানেজম্যান্ট সেন্টার সহায়তায় ক্ষতিকর প্রজাতির মাছের অনুপ্রবেশ রোধপূর্বক রোগ ও জীবানুমুক্ত পিএল/মাছের পোনা উ‍ৃপাদন ও মজুত করা সম্ভব হবে। ফলে সামুদ্রিক ও উপকূলীয় এলাকায় মাছচাষ তথা মেরিকালচার এর বিস্তার লাভ করবে এবং নিরাপদ ও রপ্তানিযোগ্য মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

কমপোনেন্ট-০৩ঃ মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের ক্ষমুায়ন ও জীবিকায়নে বিকল্প পেশায় নিয়োজনঃ

এ প্রকল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্ট হলো মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের ক্ষমায়ন ও জীবিকায়নে বিকল্প পেশায় নিয়োজন। কেননা মৎস্যজীবীদের জীবনমান উন্নয়ন ও তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন না হলে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা টেকসই হবে না। এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে মৎস্য অধিদপ্তরের পাশাপাশি অর্থ মন্ত্রণালয়ের একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান Social Development Foundation কে প্রকল্পের কমপোনেন্ট-০৩ এর সহ-বাস্তবায়নকারী হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ কমপোনেন্টের আওতায় উপকূলীয় ৪৫ উপজেলার ৪৫০টি গ্রামে মৎস্যগ্রাম গঠন করে কমিউনিটি সেভিংস গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত গ্রামগুলোতে বিভিন্ন বিকল্প পেশায় নিয়োজনের প্রশিক্ষণ শুরু করা হয়েছে। আর্থিক অনুদান ও ঋণ প্রদানের জন্য ব্যাংকের একাউন্ডে ফান্ড প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত ফান্ড হতে ৬০% সুবিধাভোগীকে অর্থ সহায়তা প্রদান করা হবে এবং প্রতিষ্ঠিত ৪৫০ টি গ্রাম হতে সার্বিক বিবেচনায় অগ্রগামী ১০০টি গ্রাম মডেল মৎস্যগ্রাম ঘোষিত হবে। এছাড়া মৎস্যজীবী গ্রামের ১৮,০০০ যুবক-যুবীকে ভোকেশনাল ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। মৎস্যজীবীদের মধ্য হতে ১০০ টি প্রডিউসার গ্রুপ তৈরি এবং নিবন্ধন করা এবং ৯০টি ইউথ ফেস্টিভাল প্রোগ্রাম ও ৬টি জব ফেয়ার আয়োজন করা হবে। ফলে মৎস্যজীবী পরিবারের যুব সদস্যদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। সর্বোপরি ৪৫টি উপজেলায় জেলে ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা এর মাধ্যমে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের ক্ষমায়ন নিশ্চিত হবে। এ কার্যক্রমে সর্বমোট ৫৪,০০০ জন জেলে সরাসরি প্রকল্পের সুবিধা আওতায় আসবে।

কম্পোনেন্ট ০৪: প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা:

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ১ জন প্রকল্প পরিচালক, ৬ জন উপ-প্রকল্প পরিচালক, ৭ জন সহকারী প্রকল্প পরিচালক, ২ জন নির্বাহী প্রকৌশলী, ৩ জন সহকারী প্রকৌশলী ও ৭৮ জন মেরিন ফিশারিজ কর্মকর্তাসহ ২৩৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারি নিয়োজিত আছেন। প্রকল্প কার্যক্রম দক্ষতার সাথে বাস্তবায়নের জন্য দেশি-বিদেশি পরামর্শক সমন্বয়ে ১টি Project Management Consultant (PMC) গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট অংশিজনদের নিয়ে একটি স্টিয়ারিং কমিটি ও একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে যাঁরা প্রকল্পটি নিয়মি তত্ত্বাবধান ও মনিটর করছেন। এ প্রকল্পের ইতিবাচক ফলাফল অর্জনের জন্য মৎস্য সেক্টরে বিশেষজ্ঞ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, সরকারি কর্মকর্তাসহ এনজিও প্রতিনিধির সাথে প্রতি ৬ মাস অন্তর মুবিনিময়/নাগরিক সংলাপ করার জন্য একটি সিটিজেন এনগেইজমেন্ট প্লাটফরম-এর সংস্থান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সংশ্লিষ্টস্টেক হোল্ডারদেরকে নিয়ে একটি জয়েন্ট মনিটরিং সেন্টার (JMC) গঠন করা হয়েছে। এ সেন্টারের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও আহরণে নিয়োজিত মৎস্যজীবী ও নৌযানকে Monitoring Control & Surveillance (MCS) এর আওতায় আনয়ন করা সম্ভব হবে।

সাম্প্রতিক কালে বিশ্বব্যাপী ক্রমাগণ অতিআহরণ জনি কারণে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ক্রমহ্রাসমান অবস্থা, ভূমি ও সমুদ্র হতে সৃষ্ট দূষণ এবং সর্বোপরি জলবায়ুর ব্যাপক পরিবুর্নের ফলে মৎস্যকুলের প্রাচুর্য্যতা, বিস্তৃতি ও প্রজাতির উপর বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাংলাদেশের সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্যসম্পদ ও এ পরিস্থিতির বাইরে নয়। অপরিকল্পিত আহরণ প্রক্রিয়ার ফলে সাগর মৎস্য শুন্য হয়ে যাওয়ার উদাহরণ পৃথিবীর অনেক দেশেই রয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ একটি জীবন্ত ও পরিবর্তনশীল এবং পুনর্ভরণ ও নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ। এ থেকে এমনভাবে সম্পদ আহরণ করতে হবে, যাতে করে পরবর্তী বংশবৃদ্ধি অব্যাহত রেখে স্থায়িত্বশীল মৎস্য আহরণ নিশ্চিত করা যায়। সাগরের বিশাল জলজ সম্পদসহ এর জীববৈচিত্রকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করার পাশাপাশি র্বুমানে পাঁচ লক্ষাধিক মৎস্যজীবীর জীবন ও জীবিকা নির্বাহে উন্নততর ব্যবস্থাপনা কৌশল নির্ধারণ করা আশু প্রয়োজন। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের বিগণ ২৫-৩০ বৎসরের আহরণের তথ্য উপাত্ত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে সাগরের মৎস্য সম্পদের অতিআহরণের প্রভাব নিরূপণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করলে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হবে, কর্মসংস্থানের পরিসর বিস্তৃত হবে, আমিষ ঘাটতি পূরণ হবে এবং সর্বোপরি মৎস্য রপ্তাণি বাণিজ্য সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে। সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্প উদ্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে বঙ্গোপসাগরে মৎস্যসম্পদের টেকসই ও সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের সুফল সুনীল অর্থনীতির নুন দ্বার উন্মোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বঙ্গোপসাগরের মাছের খাদ্যাভ্যাস ও আবাস

বঙ্গোপসাগর ভারত মহাসাগরের উত্তরে অবস্থিত ভৌগেলিক এবং অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি উপসাগর। বিশ্বের সবচেয়ে বেশী সংখ্যক নদ-নদী বিধৌত পানি প্রবেশ করে এ সাগরকে করেছে উর্বর, বৈশিষ্ট্য মন্ডিত ও বৈচিত্র্যময় মৎস্য সম্পদেসমৃদ্ধ। সমুদ্র সীমা নিয়ে পাশ্ববর্তী দেশসমুহের সাথে শান্তিপূর্ণ বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে ১,১৮,৮১৩ বর্গ কি.মি. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের সার্বভৌম একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল বেইজলাইন থেকে (১০ ফ্যাদম) থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশের সাফল্য বিশ্বপরিমন্ডলেও আজ স্বীকৃত। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার The State of World Fisheries and Aquaculture-২০২০ এর প্রতিবেদনে অভ্যন্তরীন মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ ৩য়, বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে ৫ম স্থান বিগণ ছয় বছর যাবৎ ধরে রয়েছে। পাশাপাশি বিশ্বে সামুদ্রিক ও উপকূলীয় ক্রাস্টাশিয়া ও ফিনফিশ উৎপাদনে যথাক্রমে ৮ম ও ১১তম স্থানে রয়েছে। ইলিশ মাছ আহরণকারী ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১ম; তেলাপিয়া উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে ৪র্থ এবং এশিয়ার মধ্যে ৩য় স্থান অধিকারে রয়েছে (জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২০ সংকলন)। বিভিন্ন উৎপাদনমুখী পরিকল্পনা ও বাস্তবধর্মী কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফসল আজকের এ সাফল্য।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে রয়েছে বিস্তৃর্ণ সুন্দরবন এবং এর পাশেই পৃথিবীর এগারতম গভীর সমুদ্রখাত, সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড, পূর্ব-দক্ষিণে রয়েছে কোরালসমৃদ্ধ দ্বীপ সেন্টমাটিন আর মাঝখানে বাংলাদেশের বুক চিড়ে অসংখ্য নদ-নদী দ্বারা ভূখন্ড থেকে আনি পলিসমৃদ্ধ উর্বর পানি যা বঙ্গোপসাগরকে করেছে বিশ্বের নজরকাড়া মৎস্যভান্ডার। বঙ্গোপসাগরের সাগরের মাটি পানির গুনাগুন, তাপমাত্রা, পানিরস্রোত, ঘুর্ণনের ওপর নির্ভর করে বৈচিত্রময় মৎস্যসম্পদের বিস্তার-পরিধি ও আবাসক্ষেত্র ইণ্যাদির তারতম্য রয়েছে। সাগরের সব জায়গায় সব মাছ সমান ভাবে থাকে না। সাধারনুঃ উপকূলীয় এলাকায় যেখানে ফাইটোপ্লাংক্টন/জুপ্লাংক্টন জাতীয় মাছের খাবার ও পানির তলদেশীয় মাটি সংলগ্ন এলাকায় মাইক্রো/ম্যাক্রো জীব উৎপাদনের প্রতিবেশ-পরিবেশ বিদ্যমান সেখানেই মাছের বিস্তৃতি ও অবস্থান বেশী থাকে।

৮.১ মাছের খাদ্যাভ্যাসঃ

প্রাকৃতিক পরিবেশে মাছের খাদ্য গ্রহণের ওপর নির্ভর করে মাছকে চার ভাগে ভাগ করা হয় এবং সেগুলি হলো- Herbivores, Detritus feeder, Carnivores ও Omnivores। Herbivores খাদ্য হিসেবে সবুজ উদ্ভিদ গ্রহণ করে যা খাদ্য শক্তির প্রাথমিক উৎস। উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষনের মাধ্যমে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে কার্বন ডাই অক্সাইড ও পানি থেকে খাদ্য ও শক্তি উৎপাদন করে। Herbivores আনুবীক্ষনিক উদ্ভিদ অথবা প্লাংক্টন, ক্ষুদ্র শেওলা ও বড় নরম উদ্ভিদ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। সূর্যের আলো থেকে গৃহীত শক্তি উদ্ভিদের মাধ্যমে মাছের দেহের মধ্যে প্রবেশ করে। Detritus feeder পানির তলদেশ থেকে মৃত জৈব পদার্থ প্রধানুঃ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। এ সমস্ত জৈব পদার্থ ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, উদ্ভিদ ও প্রাণির দেহের বিভিন্ন অংশের সমাহার। সাগরের এসব জৈব যৌগ সাগরের অভ্যন্তরের এবং সাগরের বাহিরের পানি বিধৌত উদ্ভিজ ও প্রাণিজ অংশ থেকে উৎপন্ন।

Carnivores সাধারনুঃ অন্যান্য ক্ষুদ্র/বড় প্রাণিকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। কীট পতঙ্গ, তাদের লার্ভা, ছোট-বড়মাছ ও অন্যান্য জীব যেমন- ব্যাঙ, শামুক, ঝিনুক এবং অন্যান্য ক্রাস্টাসিয়া গোত্রের প্রাণিরা এ মাছগুলোর প্রধান খাদ্য। মাছ যখন অন্য মাছকে খাদ্য হিসেবে আহার করে তখন তাকে Piscivores বলা হয়। Omnivores পরিবেশের খাদ্য ও প্রাচুর্যতার উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদ, প্রাণি এবং জৈব পদার্থ খাদ্য হিসেবে আহার করে। এ গোত্রের মাছগুলো Herbivores এবং Detritus feeder মাছগুলোর তুলনায় কম এবং Carnivores মাছগুলোর তুলনায় অধিক উদ্ভিদ শক্তি পরিবর্তন করতে পারে।

খাদ্য, খাদ্য গ্রহণ প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে মাছের শরীরের গঠন, মুখের অবস্থান ও আকৃতি; দাঁতের অবস্থান ও প্রকৃতি; ফুলকা ও পৌষ্টিক নালীর বৈত্রিতা দেখা যায়। খাদ্য গ্রহণের প্রকৃতির ওপর মুখের অবস্থান যেমনঃ Terminal, Inferior, Superior, Retracted এবং Protracted দেখা যায়। খাদ্যের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে দাঁত Incisor, Canine, Molar এবং Villiform এবং মাছের ফুলকার বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। উদ্ভিজ ভোজী মাছের পৌষ্টিক নালীর দৈর্ঘ্য মাছের দৈঘ্যের চেয়ে বেশী। আবার প্রাণী ভোজী মাছের

পৌষ্টিক নালীর দৈর্ঘ্য মাছের দৈর্ঘ্যের চেয়ে কম। আবার খাদ্য শিকার পদ্ধতির ওপর মাছের অতিরিক্ত অঙ্গ- প্রত্যঙ্গের (যেমনঃ Lure) সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

খাদ্যাভাসের ভিত্তিতে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মাছের বিভাজন

Sl.	Group	Genus / Family
1.	Detritivores	Tilapia
2.	Scanvengers	Anguilla (Anguillidae), Some Shark
3.	Herbivores	
	3.1	Grazers, eg- Hypostomus (Lolicariidae), Surgeon fish, Acanthurids, Siganids, Parrot fish, Siganids.
	3.2	Browsers, eg- *Chlorurus bleekeri* (Scaridae), *Halichoeres argus* (Labridae),
	3.3	Phytoplanktivores, eg- *Escualosa thoracata* (Clupeiddae), *Caesio cuning* (Caesionidae)
4.	Omnivores	: Eg- Rutilus (Cyprinidae), Butterfly fish, Chaetodontids.
5.	Carnivores	
	5.1	Benthivores:
		a. Picking at relatively small prey, eg- Gasterosteus (Gasterosteidae)
		b. Disturbing, then picking at prey, eg- Sufflamen (Batistidae),
		c. Picking up substrate and sorting prey, eg- Lethrinops (Cichlidae)
		d. Grasping relatively large prey, eg- Balistis (Balistidae)
	5.2	Zooplanktivores:
		e. Filter feeder, eg- Engraulis (Engraulidae) feeding on nauplii
		f. Particulate feeder, eg- Engraulis (Engraulidae) feeding on adult zooplankton
	5.3	Arieal feeder: eg- Toxotes (Toxotidae)
	5.4	Piscivores:
		g. Ambush hunters, eg- Platycephalus indicus (Platycephalidae), Ichthyscopus lebech (Uranoscopidae)
		h. Lurers, eg- Lophius (Lophiidae), Anterrius hispidus (Antennariidae)
		i. Stalkers, eg- Esox (Esocidae)
		j. Chasers, eg- Istiophorus platypterus (Istiophoridae), Rachycentron canadum (Rachycentridae), Serranids, Snappers.
		k. Ectoparasites, including Scale eater, eg- Therapon (therapotidae) and fin eater Belonophago (Citharinidae)
6.		Feed on other animals: Angel fish, Snappers, Pomacanthids. Lethrinids, Lutjanids.

৮.২ মাছের আবাসঃ

বঙ্গোপসাগরের বিভিন্ন অংশ বা এলাকা স্বাতন্ত্র এবং নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে মহীমান্বিত। সাগরের ভূ-তাত্ত্বিক অবস্থা, স্বাদু পানির মিশ্রণ, পানির ঘূর্ণয়ন, পানির গুনাগুন, মাটি-পানির উর্বরতা, পানির গভীরতা, বায়ু প্রবাহ, তাপমাত্রা ইণ্যাদি ভেদে প্রত্যেক এলাকাকে করেছে জীব বৈচিত্রে স্বতন্ত্র। এ সব বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে সাগরে বিভিন্ন স্বতন্ত্র এলাকা বিদ্যমান এবং এতে রয়েছে পরিবেশ-প্রতিবেশ ভিত্তিক মৎস্যসম্পদ। এলাকাসমূহ হলো-

১. উপকূলীয় এলাকাঃ উপকূলীয় ও সামুদ্রিক পরিবেশে প্যারাবন (Mangrove), কোরালসমৃদ্ধ এলাকা (Coral rich area), শৈবাল এলাকা (Seagrass bed), মোহনা, পানির ঘূর্ণয়ণ এলাকা (Up welling and down welling) এবং মাছের অভিপ্রয়াণ পথ (Migration route) প্রভৃতি সামুদ্রিক জীবসমুহের প্রজনন, লালন, বিচরণ, বৃদ্ধি, বাসস্থান নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বঙ্গেপসাগরের বাংলাদেশ জলসীমার পূর্বাংশে সেন্টমার্টিন্স দ্বীপের চারপাশে কোরাল সমৃদ্ধ এলাকা, শৈবাল বিশিষ্ট এলাকা, কক্সবাজার জেলার চকরিয়া- উখিয়ার প্যারাবন, খুলনা-সাতক্ষীরার সুন্দরবন এলাকা চিংড়ি ও মৎস্যসম্পদের প্রজনন, নার্সারী এলাকা ও বিচরণ ক্ষেত্র

হিসেবে খ্যাত। চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনাসহ সমগ্র উপকূলীয় এলাকা নদী বিধৌত পলিসমৃদ্ধ নরম ও কাদাময়। এ সব উপকূলীয় এলাকা বিভিন্ন খনিজ পুষ্টিসমৃদ্ধ, উর্বর এবং মাছের লালন ও বিচরণ ক্ষেত্র।

২. প্যারাবন: বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল বিস্তৃর্ণ সুন্দরবন এবং কক্সবাজার জেলার চকরিয়া-উখিয়া-টেকনাফ উপজেলার বিস্তৃর্ণ প্যারাবন সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের প্রজনন, লালন ও বিচরণ ক্ষেত্র এবং সামুদ্রিক জীব বৈচিত্রে ভরপুর এবং মৎস্যভান্ডার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সুন্দরবনের জলরাশির আয়তন প্রায় ২,০০০ বর্গ কি.মি. যা সংরক্ষিত বনের (Sundarban Reserve Forest) প্রায় ৩৩% শতাংশ। এ জলরাশি নদী, উপনদী খাল শাখা নদী, চাতাল/বিল যা বড় নদী থেকে পুষ্টি ও স্বাদু পানি সরবরাহ করে সুন্দরবনকে সমৃদ্ধ করেছে। সুন্দরবনের জলরাশিতে ২৭ পরিবারের ৫৩ প্রজাতির উপরিতলের মাছ, ৪৯ পরিবারের ১২৪ প্রজাতির তলদেশীয় মাছ, ৫ পরিবারের ২৪ প্রজাতির চিংড়ি, ৩ পরিবারের ৭ প্রজাতির কাঁকড়া, ২ প্রজাতির গ্যাস্ট্রোপোড, ৪ প্রজাতির লবস্টার এবং ১ পরিবারের ৩ প্রজাতির কচ্ছপ রয়েছে (IUCN,1994)। বিভিন্ন জরিপ ও গবেষণায় দেখা যায়, বঙ্গোপসাগরের বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মাছের ৯০% এবং সকল প্রকার মাছের প্রায় ৩৫% তাদের নার্সারী ও প্রজননের জন্য সুন্দরবন ও তৎসংলগ্ন উপকূলীয় এলাকার উপর নির্ভরশীল। প্যারাবন সামুদ্রিক পরিবেশের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক (যেমন- মৎস্যসম্পদ ও বন্য জীব, মৎস্যসম্পদের মাধ্যমে দেশী-বিদেশী মুদ্রা অর্জনকারী) হিসেবে পালন করে থাকে। প্যারাবন পরিবেশ ও প্রতিবেশের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে বিভিন্নভাবে মানব সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনে সহায়তা করে থাকে। যেমন- ১. প্যারাবন মাছ ও চিংড়ির নার্সারী ক্ষেত্র, ২. বিভিন্ন সামুদ্রিক ঝড়- জলোচ্ছ্বাসে প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক হিসেবে যান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ কওে, ৩. প্যারাবন জ্বালানী, বিভিন্ন কাজের খুঁটি ও আসবাবপত্রের কাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, ৪. কার্বন ডাই অক্সাইড ও অক্সিজেন সরবরাহের মাধ্যমে বায়ুমন্ডল ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। স্মরণকাল থেকে মানুষ প্যারাবন থেকে জ্বালানী কাঠ, আসবাব পত্রের কাঠ ও ফলমুল ইণ্যাদি সংগ্রহ করে উপকৃত হয়ে আসছে। সাম্প্রতিককালে মানুষ ধানচাষ ও উপকূলীয় জলাশয়ে মাছ ও চিংড়িচাষ সম্প্রসারণ নিমিত্ত ধীরে ধীরে প্যারাবন ধ্বংস করে আসছে। বন বিভাগের উদ্যোগে আবার প্যারাবন সম্প্রসারণের উর্ধ্বগতিও অব্যাহত রয়েছে। প্যারাবন এলাকায় Raconda, Sea perches রাজ কাঁকড়া, লবস্টার এর মাছের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়।

৩. কোরালসমৃদ্ধ এলাকা: বাংলাদেশের মূল ভূখন্ডের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল টেকনাফ থেকে প্রায় ১০ কি.মি. দক্ষিণে ২৪° উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯২° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে সেন্ট মার্টিন দ্বীপ। নীল জলে ঘেরা দ্বীপটি বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। আর সেই কারনে অন্যান্য দ্বীপ থেকে এটি আলাদা এবং পর্যটকদের কাছেও আকর্ষনীয়। এর পারিপার্শ্বিক লবনাক্ত জলাশয়ের পরিবেশ ও প্রতিবেশগণ অন্যান্য বৈশিষ্ট্য এবং বিদ্যমান জীববৈচিত্র্য বঙ্গোপসাগরকে করেছে জীববৈচিত্রে সমৃদ্ধ মৎস্যভান্ডার। কোরালসমৃদ্ধ দ্বীপটির ভাটার নিম্নস্তর ধেকে ৮ মিটার গভীরতায় পর্যন্ত কোরাল জন্মে বলে অনেকে মনে করেন। মাহমুদ ও হায়দার (১৯৯২) এ দ্বীপে ১০ প্রজাতির কোরালের উপস্থিতি উল্লেখ করেন। Tomascik (1997) ৬৮ প্রকার কোরালের উপস্থিতি বর্ননা করেছেন। বিভিন্ন প্রকার কোরালের মধ্যে ছাতা কোরাল, বৃক্ষ কোরাল, পাখা কোরাল ও মগজ কোরাল উল্লেখযোগ্য। দ্বীপের বিদ্যমান কোরালগুলো বিভিন্ন অবস্থায় পাওয়া যায়। এর মধ্যে জীবাশ্ম (মৃত) কোরাল, জীবি কোরাল ও নরম কোরাল ইণ্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৩.১ জীবাশ্ম (মৃত) কোরাল: সেন্টমাটিন দ্বীপের তীরবর্তী এলাকায় জীবাশ্ম কোরাল ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এর মধ্যে Favia, Goniopora, Favites, Golaxea, Acropora, Montipora, Goniastrea and Porites অন্যতম। এ সকল কোরাল বিক্রয়ের জন্য সংগ্রহ করা হয় এবং তা ঘর সাজানো কাজে ব্যবহৃত হয়। এসব কোরাল অত্যন্ত সুন্দর, আকর্ষনীয় ও দৃষ্টিনন্দন।

৩.২ জীবি কোরাল: Tomascik সেন্টমার্টিন দ্বীপের চার পাশে ৬৮ প্রকার কোরালের উপস্থিতির বিষয় উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে ২২ প্রকার কোরাল যথেষ্ট পরিমাণে, ১৫ প্রজাতির কোরাল মোটামুটিভাবে এবং ২৯ প্রজাতির কোরাল কদাচিৎ পাওয়া যায়। যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় কোরালের মধ্যে প্রধানুঃ Favia, Goniopora, Favites, Czphaslsia, Goniastrea and Porites গণের প্রজাতিসমুহ উল্লেখযোগ্য।

৩.৩ নরম কোরাল: Tomascik এর মতে, ৩টি বর্গের ৬টি পরিবারের মোট ১০টি নরম ও তুলতুলে কোরাল জন্মে এ দ্বীপে। এসকল কোরাল কঠিন আবরণে আবৃত অবস্থায় থাকে। এ সকল কোরাল পাথরের সাথে জড়িয়ে থাকে। কোরালসমৃদ্ধ এলাকায় Scorpion fish, Parrot fish, Sea urchins, Rabbit fishes, Stone fish, Flzing fish, Gurnard, Soldier fish, Needle fish, Surgeon fish, Cardinal fish, Butterflz fish ইণ্যাদি মাছের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়।

৪. শৈবালসমৃদ্ধ এলাকা: সামুদ্রিক শৈবাল সেন্টমার্টিন দ্বীপবাসীদের নিকট হেজলা নামে পরিচিত। সামুদ্রিক শৈবালকে তিনটি প্রধান পর্বে ভাগ করা যায়, যেমন; ক্লোরোফাইটা (সবুজ শৈবাল), পিওফাইটা (বাদামী শৈবাল) ও রোডোফাইটা (লাল শৈবাল)। প্রফেসর আফতাব উদ্দিন, সামুদ্রিক বিজ্ঞান ইনিস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় Sea Weed of Bangladesh (২০১৯) গ্রন্থে ২৯ প্রজাতির ক্লোরোফাইটা, ৪৩ প্রজাতির পিওফাইটা ও ৭৮ প্রজাতির রোডোফাইটা সেন্টমার্টিন দ্বীপে উপস্থিতির বর্ননা করেন। সেন্টমাটিন দ্বীপের পাথরে তলদেশ এবং ভৌগলিক অবস্থানগণ কারনে এখানে বৈচিত্রময় শৈবালের সন্নিবেশ দেখা যায়। দ্বীপের চারপাশের পানির গুনাগুন এবং পাথুরে তলদেশের কারনে শৈবালের জন্ম ও বৃদ্ধির উপযোগী। সেন্টমার্টিন দ্বীপের চারপাশ ছাড়াও টেকনাফ, ইনানী, বাকখালী নদীর মোহনা, সোনাদিয়া, সুন্দরবন ও কুয়াকাটা যেখানে নরম মাটির তলদেশ (কাদা ও বালি) ও উচ্চ ঘোলাত্ব সেখানেও কিছু কিছু শৈবাল পাওয়া যায়। প্রতিবেশের (Ecoszstem) স্বাস্থ্য ভাল নির্দেশক হলো শৈবালের উপস্থিতি। স্থানীয় অধিবাসীরা হিপনিয়া প্রজাতির শৈবাল সংগ্রহ করে তা মিয়ানমার লোকদের কাছে বিক্রয় করে বলে জানা যায়। এ শৈবাল থেকে আগার, এলজিন ও কেরাগিনন নামক দ্রব্য উৎপাদন করা হয়। এখানে প্রাপ্ত শৈবালের মধ্যে রয়েছে *Hypnea cornuta, Liagora ceranoides, Halzmenia dilatata, Actinotrichia fragilis, Ceramium crusiatum, Sargassum sp. Padina australis, Secinaia complanata* ইণ্যাদি। শৈবালসমৃদ্ধ এলাকায় Parrot fish, Wrasses, Cornet fishes, Sea horses ইণ্যাদি মাছের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়।

৫. পাথুরে এলাকা: শক্ত মাটি ও পাথুরে তলদেশ বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশ জলসীমায় দক্ষিন পূর্বাঞ্চলে (কক্সবাজার, উখিয়া, টেকনাফ) দেখতে পাওয়া যায়। শক্ত মাটি ও পাথুরে তলদেশে সাধারনুঃ Shark, Snapper, Grouper, Grunter, Sweetlip, Damsel fish, Lobster Ozster, Seashell এবং শামুক-ঝিনুকের আধিক্য বেশী।

৬. নরম মাটির আবাস: নরম মাটির আবাসস্থল (কাদা ও বালি) মৎস্যসম্পদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রজনন ও বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয়। বিভিন্ন নদ-নদী এবং তাদের শাখা-প্রশাখা উজান থেকে বালি ও পলি বহন করে সাগর তলদেশকে সমৃদ্ধ করে আসছে। নদ-নদী শুধু বালি বা পলি নয়, বিভিন্ন খনিজ পুষ্টি বহন করে সাগরকে করেছে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্যে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ। পলি ও পুষ্টি পরিবহনের কারনে নদীর মুখ ও মোহনাঞ্চল মাছের প্রাকৃতিক খাদ্যে পুষ্ট, উর্বর এবং মৎস্যসম্পদে সমৃদ্ধ। নরম মাটির তলদেশ সংলগ্ন এলাকায় Gurnards, Flatheads, Threadfin bream, Goat fish, Sickle fish মাছের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়।

৭. মাটির উপরিতল আবাস (Pelagic habitats): মহীসোপান (Continental shelf) এর বাইরে বিশাল সমুদ্র এলাকা কম অক্সিজেনসমৃদ্ধ। এ স্বল্প অক্সিজেন জলরাশিতে প্রধানুঃ Lantern fish (Familz: Mictopidae) মাছের আধিক্য বেশী দেখা যায়। Lantern প্রাণী প্লাংকটন খাদ্যের জন্য দৈনিক দুইবার খাড়া অভিপ্রয়ান (Diurnal vertical migration) করে থাকে। এ বিশাল মুক্ত সাগর উপরিতলে বড় শিকারী মৎস্যসম্পদ (Lantern, Squids, Tunas, Hairtails, Bill fishes) আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। মহীসোপানের উপরিতলের জলরাশিতে অর্থ্যাৎ Shelf sea উপরিতলের মৎস্যসম্পদের দ্বিতীয় সমৃদ্ধ এলাকা। এখানে Carangids, Pomfret, Sardinellas, Anchovies, Hairtails এবং ছোট টুনা মাছের আবাসস্থল। কাদা-বালি তলদেশের উপরি ভাগের মৎস্য আহরণ ক্ষেত্রের উপরিভাগ পুষ্টিসমৃদ্ধ এবং প্রাকৃতিক মাছের খাদ্যসমৃদ্ধ। উপকূলীয় Neritic এলাকা পলি নদী বিধৌত পানি উর্বর এবং মৎস্য সম্পদের নার্সারী, প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্র। উপকূলীয় (Pelagic) এলাকায় Carangids, Clupeids, Scombrids, Engraulids, Sardinellas, Indian Mackerels, Anchovies এর আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। Mid water trawl, মৎস্য ট্রলার, ও বড়শী (Long line) দ্বারা এ সকল মাছ আহরণ করা হয়।

৮. তলদেশীয় মাটি সংলগ্ন আবাস (Demersal habitats): বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশ জলসীমা সমগ্র মহীসোপানের নরম মাটি (বালি ও কাদা) পরিবেষ্টিত। বালি ও কাদা উভয় মাটি কৃা সমৃদ্ধ এলাকা বৈচিত্র মৎস্য ও অন্যান্য মেরুদন্ডী ও অমেরুদন্ডী জলজ প্রাণিতে ভরপুর। এ নরম মাটির উপকূলীয় তলদেশ চিংড়ি, পোয়া, কাটামাছ, Flat fish, Thread fin bream এবং গভীর তলদেশে Barracudas, Pomfrets, Eels, Hairtails, Snappers, Groupers, Heamulids, Shark এবং Ray এর আধিক্য বেশী। এ সকল মৎস্যসম্পদ Bottom Trawl, তলদেশীয় ফাঁস জাল, বড়শী ও Bottom set net দ্বারা আহরিত হয়।

৮.৩ মাছের আবাসস্থল পরিবর্তন/সংকোচন

বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং খাদ্য শস্য উৎপাদনের নিমিত্ত নিকট অতীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড বিভিন্ন স্থানে বাঁধ নির্মানের কারনে দেশের জলজ প্রতিবেশ, মাছের প্রজনন ও আবাসস্থলের পরিবর্তন হয়েছে। ফলে মাছের স্বাধীন অভিপ্রয়ানে (স্বাদু পানি থেকে লবনাক্ত পানি কিংবা লবনাক্ত পানি থেকে স্বাদু পানি) সম্পূর্ণভাবে বাধাগ্রস্থ হয়। গঙ্গার উজানে ফারাক্কা বাধ নির্মানের ফলে পানির স্বাভাবিক গতিপথ বাধাগ্রস্থ হয়। ফলে সুন্দরবনের লবনাক্ততা বৃদ্ধি পায় এবং বনের বৃক্ষরাজির স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে প্রভাব পড়ে। সুন্দরবন বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অবস্থিত এবং এর আয়তন প্রায় ৬,০০,০০০ হেক্টর। ইহা একক ঘন প্যারাবন হিসেবে পৃথিবীর বৃহত্তম। ফারাক্কা বাঁধের কারনে সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত নদী, শাখা নদীর প্রায় ৪০% স্বাদু পানির প্রবাহ কমে যায়। এতে সুন্দরবনের স্বাভাবিক জীব বৈচিত্রে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে এবং প্যারাবনের বিক্ষিপ্ত সম্প্রসারণের ফলে চিংড়ি চাষ ও ধান চাষ নিয়ে প্রায়শই দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়।

মৎস্যসম্পদের স্বীকৃত ধ্বংসাত্মক মোহনা বেহুন্দি জালের সংখ্যা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় ও Neritic পানির মৎস্য আবাস ও মাছের উৎপাদন ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। উপকূলীয় এলাকায় লার্ভা ও কিশোর মাছ ধরার ফলে এবং পাশাপাশি মাতৃমজুদে যুক্ত হতে না পারায় মাছের মজুতও দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। বদ্ধ জলাশয়ে চাষের নিমিত্ত উপকূলীয় উৎস থেকে চিংড়ি পোনা আহরণের ফলে চিংড়ি উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান এবং মুল মজুদে ফিরতে না পারায় মাতৃমজুদ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। তা ছাড়াও একটি চিংড়ি পোনা আহরণ করতে গিয়ে ১,৬০০ টি ম্যাক্রো- প্লাংক্টন ধ্বংস হয়ে যায়।

বাংলাদেশে ২৩০ টির অধিক ট্রলার বানিজ্যিকভাবে মৎস্য ও চিংড়ি আহরণে নিয়োজিত রয়েছে। এর মধ্যে ৭৭ টি মৎস্য ট্রলার তলদেশীয় মাছ এবং ৩২ টি চিংড়ি ট্রলার তাদের প্রকৃতিগণ ভাবে মাছ ও চিংড়ি আহরণ করে। মৎস্য ট্রলারের জালের ববিন ও চিংড়ি ট্রলারের Tickler chain দ্বারা সর্বদা মাটির ঘর্ষনের মাধ্যমে তলদেশীয় মাছ ও চিংড়ি আহরণ করে। এতে প্রতিনিয়ত মাটির ঘর্ষণের ফলে Bottom topography সমান হয় এবং তলায় জমে থাকা বিভিন্ন অপদ্রব্য পানিতে মিশ্রিত হয়ে তলার পরিবেশ ও প্রতিবেশ নষ্ট হয়ে তলদেশীয় মাছ ও চিংড়ির আবাসস্থল নষ্ট হয়ে যায়।

সমুদ্র দূষণ (শিল্প কারখানার বর্জ্য, কৃষিজ বর্জ্য, সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য, নৌযানের বর্জ্য) এবং মৎস্য আহরণ এলাকায় নৌ ও বিমান বাহিনী কর্তৃক ফায়ারিং এর কারনে মাছের প্রজনন, বৃদ্ধি ও বাসস্থানের পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। এতে মাছ মারা যায় এবং মাছ ও চিংড়ির মাংশ পেশীতে বিষাক্ত পদার্থ জমা হতে দেখা যায়। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদীর মোহনায় পলি জমে ভরাট হয়ে উপকূল ও মোহনায় বাস্তুসংস্থানগণ পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। পলি জমার সাথে সাথে মৎস্য সম্পদের প্রজনন, অভিপ্রয়ান ও আবাসস্থলে বিরুপ প্রভাব পড়ে। Bottom topograghy এর পরিবর্তন, ঘোলাত্ব বৃদ্ধি এবং ঘোলাত্বের উপকরণ সংযোজনে বাস্তুসংস্থানের পরির্বুনের সাথে সাথে মাছের আবাসস্থলেরও পরিবর্তন ঘটে।

পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, কর্ণফুলীসহ অসংখ্য নদ-নদী এবং তাদের শাখা নদী ভূখন্ড থেকে পলি ও পুষ্টি উপাদান পরিবহন করে বঙ্গোপসাগরকে করেছে উর্বর। মৌসুমী বায়ু প্রবাহ, পানির নীচের ঘুর্ণয়ন, পানি প্রবাহ প্রভৃতি সাগরে সৃষ্টি করেছে অসংখ্য গিরিখাদ। এ সকল গিরিখাদ সাগরের মৎস্যকুলের প্রজনন ক্ষেত্র ও আবাসস্থল। মাছের খাবার ও আবাসের পছন্দের তারতম্যের কারনে সাগরের এক এক জায়গায় এক এক প্রজাতির মাছের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়াও স্বাদু পানির মিশ্রন, বায়ু প্রবাহ, তাপমাত্রা, পানির ঘুর্ণয়ন, তলদেশের মাটির প্রকার, পুষ্টি উপাদানের পরিমানের বিভিন্নতা ইণ্যাদিও বিভিন্ন প্রজাতির মাছের আবাসের সহায়ক। মৎস্যসম্পদের বৃদ্ধি, নিরাপদ বিচরণ, টেকসই জলজ জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় ব্লু-ইকোনমিতে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করতে করতে পারে।

Ecology and habitat of Marine fishes in the Bay of Bengal

Coastal / near shore (<50m)		Deep sea / Open Ocean (>50m)	
Benthic / Demersal	Pelagic	Benthic / Demersal	Pelagic
Muraenidae (Morays)	Elopidae (Tenpounder)	Muraenidae (Morays)	Paralepididae (Barracudinas)
Scaridae (Parropt Fishes)	Hemiramphiidae (Halfbeaks)	Echeneidae (Remoras)	Hemiramphiidae (Halfbeaks)
Ophichthidae (Snack eels)	Megalopteridae (Tarpons)	Ophichthidae (Snack eels)	Myctophidae (Lantern fishes)

Coastal / near shore (<50m)		Deep sea / Open Ocean (>50m)	
Congridae (Conger eels)	Spyraenidae (Barracudas)	Congridae (Conger eels)	Spyraenidae (Barracudas)
Uranoscopidae (Stargazers)	Belonidae (Needle fishes)	Lophidae (Angler fishes)	Belonidae (Needle fishes)
Muraenaesocidae (Pike conger)	Clupeidae (Herring/Sardinellas/Shad)	Antennariidae (Frog fishes)	Bregmacerotidae (Codlets)
Pinguipedidae (Sandperches)	Chanidae (Milk fish)	Ogcocephalidae (Bat fish)	Chanidae (Milk fish)
Blenniidae (Blennies)	Dussumieriidae (Round herring)	Berycidae (Alfonsinos)	Rachycentridae (Cobia)
Gobiidae (Gobies)	Carangidae (Jacks, Scads)	Macrouridae (Grenadier)	Carangidae (Jacks, Scads)
Psettodidae (Spiny turbots)	Engraulidae (Anchovies)	Ephippidae (Spade fishes)	Macrouridae (Grenadier)
Kurtidae (Nursery fishes)	Bregmacerotidae (Codlets)	Zeidae (Dories)	Bregmacerotidae (Codlets)
Acanthuridae (Surgeon Fishes)	Chirocentridae (Wolf herrings)	Moridae (Moras)	
Ephippidae (Spade fishes)	Prestigasteridae (Ilishas / Pellonas)	Echeneidae ((Remoras)	Echeneidae ((Remoras)
Plotosidae (Eel cat fish)	Caesionidae (Fusiliers)	Acropomatidae (Lantern bellies)	
Scatophagidae (Scats)	Gerriidae (Silverbiddies)	Ophidiidae (Cusk eels)	
Pangasiidae (Pangasiid cat fish)	Haemulidae (Grunts)	Gemphylidae (Snake mackerels)	Coryphaenidae (Dolphin fishes)
Soleidae (Soles)	Trichiuridae (Cutlass fishes)	Callionymidae (Dragonets)	Trichiuridae (Cutlass fishes)
Arridae (Sea cat fishes)	Stromatidae (Silver pomfrets)	Acrommatidae (Lantern bellies)	
Cyanoglossidae (Tongue soles)	Chaetodontidae (Butterfly Fishes)	Cynoglossidae (Tongue soles)	
Synodopntidae (Lizard fishes)	Pomacanthidae (Angel Fish)	Synodopntidae (Lizard fishes)	
Triacanthidae (Tripod fishes / Triplespines)	Chamsodontidae (Gapers)	Caproidae (Deep boar fishes)	
Ophidiidae (Cusk eels)	Exocoetidae (Flying fishes)	Monocanthidae (File fish /Leatherjackets)	Exocoetidae (Flying fishes)
Balistidae (Trigger fishes)		Ostraciidae (Box fishes)	
Menidae (Moon fish)	Caesionidae (Fusiliers)	Deretmidae (Spinyfins)	Deretmidae (Spinyfins)
Siganidae (Rabbit fishes)		Tetraodontidae (Puffers)	
Holocentridae (Squirrel fishes/ Soldier fishes)	Chamsodontidae (Gapers)	Holocentridae (Squirrel fishes / Soldier fishes)	
Gerriidae (Silverbiddies)		Diodontidae (Porcupine fishes)	Scombridae (Tuna/Mackerel)

Coastal / near shore (<50m)		Deep sea / Open Ocean (>50m)	
Haemulidae (Grunts)		Chlorophthalmidae (Green eyes)	Xiphiidae (Sword fishes)
		Beryciidae	Istiophoridae (Bill fishes)
Fistularidae (Cornet fishes),			Molidae (Molas)
Centriscidae (Shrimp fishes)		Paralichthyidae (Sand flounder)	Phosichthyidae (Light fishes)
Syngnathidae (Seahoreses)		Syngnathidae (Sea horeses)	Stomiidae (Scaly dragon fishes)
Scorpaenidae (Scorpion fish)		Scorpaenidae (Scorpion fish)	
Angruillidae (Fresh water eels)		Bembridae (Deepwater flatheads)	
Synanciidae (Stone fishes)		Nomeidae (Drift Fishes)	
Dactylopteridae (Flying gurnards)		Dactylopteridae (Flying gurnards)	
Leiognathidae (Pony fishes)			
Lutjanidae (Snappers)		Lutjanidae (Snappers)	
Lobotidae (Tripletails)			
Sparidae (Porgies)		Sparidae (Porgies)	
Lethrinidae (Emperors)		Lethrinidae (Emperors)	
Nemipteridae (Threadfin breams)		Nemipteridae (Threadfin breams)	
Polynemidae (Threadfins)		Percophidae (Duckbills)	
Mullidae (Goat fish)			
Pempheridae (Sweepers)			
K,phosidae (Seachubs)			
Drepaniidae (Sickle fishes)			
Cirrhitidae (Hawk Fishes)			
Cepolidae (Band Fishes)		Cepolidae (Band Fishes)	
Mugilidae (Mullets)		Mugilidae (Mullets)	
Pomacentridae (Damsel Fishes)			
Labridae (Wrasses)		Labridae (Wrasses)	
Apistidae (Wasp Scorpion fish)			
Platycephalidae (Flatheads)		Platycephalidae (Flatheads)	
Ambassidae (Glass fishes)			
Acropomatidae Lantern bellies)		Acropomatidae (Lantern bellies)	
Serranidae (Groupers)	Latidae (Sea perches)	Serranidae (Groupers)	
Terapontidae (Grunters)			
Priacanthidae (Bigeyes)		Priacanthidae (Bigeyes)	

Coastal / near shore (<50m)		Deep sea / Open Ocean (>50m)	
Apogonidae (Cardinal fishes)			
Sillaginidae (Sillagos)		Sillaginidae (Sillagos)	
Lacariidae (False trevally)		Lacariidae (False trevally)	
Sciaenidae (Croakers)			
Citharidae (Largescale flounder)		Citharidae (Largescale flounder)	
Bothidae (Lefteye flounder)		Bothidae (Lefteye flounder)	
Triglidae (Gurnards)		Triglidae (Gurnards)	
Ariommatidae (Ariommas)		Ariommatidae (Ariommas)	
Zeidae (Dories)		Zeidae (Dories)	

মৎস্য আহরণে বেহুন্দি জালের ক্ষতিকর প্রভাব, নির্ভরশীল জেলে সম্প্রদায়, সমস্যা ও সুপারিশ

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে টেকনাফ হতে দক্ষিণ-পশ্চিমে সাতক্ষীরা পর্যন্ত বিস্তৃত ৭১০ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূলীয় ১৪টি জেলায় জোয়ার ভাটার সাথে খাপ খাইয়ে আবহমানকাল থেকে জেলে সম্প্রদায় মৎস্য আহরণের জন্য বেছে নিয়েছে বেহুন্দি জাল, যা অঞ্চল ভেদে বিন্দি জাল বা বাঁধাজাল নামে পরিচিত। দীর্ঘ উপকূলীয় অঞ্চলে বিগণ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২০,৭৫০টি নৌকা এবং ৪৯,১৬৩টি বেহুন্দি জাল দ্বারা ১,৫৮,৭৫১ মে.টন মাছ ও চিংড়ি ধৃত হয়েছে, যা মোট সামুদ্রিক মাছের উৎপাদনের ২৪.০৫ ভাগ। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, বেহুন্দী জালে কম বানিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন মৎস্যসম্পদ ছাড়াও অনেক অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন মাছ ও চিংড়ির অনেক প্রজাতিসমুহ কিশোর অবস্থায় আটকা পড়ে থাকে।

বেহুন্দিজাল একধরনের থলের ন্যায়, যা দেখতে অনেকটা কোনাকৃতি বা মোচাকৃতির হয়ে থাকে। জালের মুখের দিকের আয়তন ১০.০ থেকে ১০০.০ বর্গমিটার যা ক্রমশঃ সরু হতে হতে শেষ প্রান্তে (Cod End) ১.০ - ১.৫ বর্গমিটার হয়ে থাকে। এর শেষ প্রান্ত খোলা এবং জাল স্থাপনের সময় রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। জালের সম্মুখ প্রান্তে জিহ্বার মু দেখতে দু'টি বর্ধিত অংশ (Wing of Net) রয়েছে যেগুলো রশি দিয়ে বাঁশ অথবা ফাঁপা ড্রামের সাথে বেঁধে ভাসিয়ে রাখা হয়। আবার বাঁশ অথবা ড্রাম পানির নীচে মাটিতে শক্ত করে পুঁতে রাখা কাঠের খুটির সাথে বেঁধে রাখার ব্যবস্থা আছে, যাতে পেতে রাখা জাল জোয়ার-ভাটার টানে দূরে ভেসে যেতে না পারে।

৯.১ বেহুন্দি জালের ব্যবহার পদ্ধতিঃ

জোয়ারের পানি জালের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় ভেসে চলা মাছ জালের শেষ প্রান্তে গিয়ে আটকে থাকে এবং জোয়ারের প্রতিকূলে আর বের হয়ে আসতে পারে না। জোয়ার পূর্ণ অবস্থায় এলে জালের শেষ প্রান্তের রশি খুলে মাছ সংগ্রহ করা হয় এবং পরবর্তী ভাটার অনুকুলে আবার আগের মুই জাল পেতে রাখা হয়। এভাবেই জেলেরা উপকূলীয় এলাকায় বেহুন্দি জাল দিয়ে জোয়ার ভাটার স্রোতের ওপর নির্ভর করে প্রায় সারা বছরই মাসে ২০-২৫ দিন, প্রতিদিন ২-৪ বার এবং প্রতিবারে ৪-৫ ঘন্টা বেহুন্দি জাল পেতে মৎস্য ও চিংড়ি আহরণ করে।

সামুদ্রিক বেহুন্দি জাল ৭-১০ দিন পর্যন্ত পূর্ণিমা ও অমাবশ্যার ৩/৪ দিন পূর্ব থেকে ৩/৪ দিন পর পর্যন্ত সময় (যাকে জেলেদের ভাসায় "জো" বলা হয়) সমুদ্রে ২৫ থেকে ৪০ মিটার গভীর এলাকায় জোয়ারের অকুকুলে পেতে রাখা হয় এবং মাসের অবশিষ্ট দিনগুলোকে জেলেরা "ডালা" বলে সে সময়ে সমুদ্র থেকে জাল উঠিয়ে এনে শুকিয়ে ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করে পুনরায় পাতবার জন্য প্রস্তুত করে।

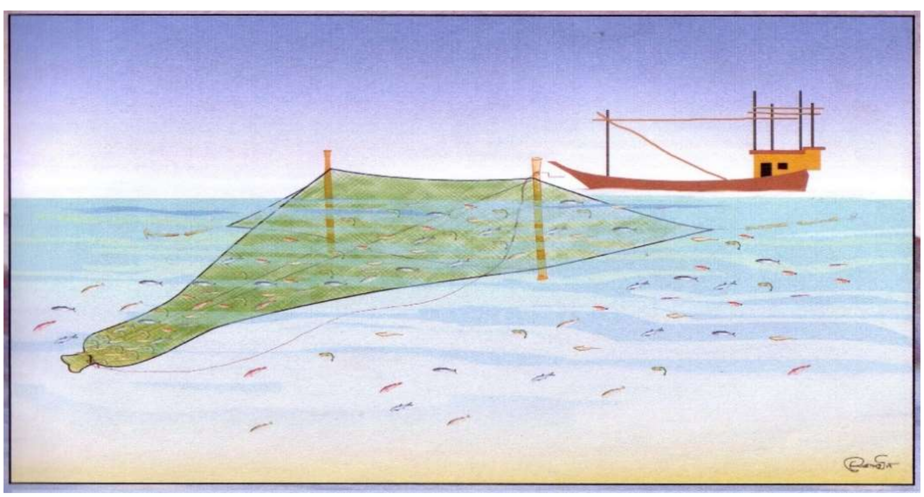

চিত্রঃ সামুদ্রিক বেহুন্দী জাল

৯.২ বেহুন্দি জালের ক্ষতিকর প্রভাবঃ

জালের মুখের ফাঁস জালের প্রকার ভেদে ২০ থেকে ১৪০ মিলি মিটার যা ক্রমান্বয়ে ছোট হতে হতে শেষ প্রান্তে (Cod End) ৫ থেকে ২২ মি. ডম. পোঁছে। সামুদ্রিক মৎস্য আইনে সামুদ্রিক বেহুন্দী জালের শেষ প্রান্তের ফাঁস কমপক্ষে ৪৫ মি.মি. রাখার বিধান রয়েছে। সাম্প্রতিককালে মোহনা বেহুন্দিজালকে পরিবর্তিত (Modified) করে জালের সর্বাংশে একই আকারের ফাঁস (৬-৮ মি.মি. বেশী নয়) রেখে ছোট বেহুন্দিজাল তৈরী করে থাকে, জেলেদের ভাসায় যাকে পেকুয়া জাল বলা হয়, যা মৎস্য সম্পদের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রকল্পের এক জরিপ থেকে দেখা যায়, বেহুন্দি জালে বিভিন্ন সময়ে প্রায় ১৮৭ প্রজাতির মাছ, চিংড়ি ও অন্যান্য প্রজাতির প্রাণী ধরা পড়ে। ধৃত মাছের মধ্যে লইট্টা, পোয়া, ফাইস্যা, চেওয়া, চিরিং, ছুরি, অলুয়া, তপসি, কাটা, চাপিলা, চান্দা, মাইট্টা, বাগদা চিংড়ি, চাপা চিংড়ি, লইল্যা চিংড়ি, গুড়া ইচা ইণ্যাদি উল্লেখযোগ্য। মোহনা বেহুন্দি জালের ফাঁস অনুমোদিত ফাঁসের চেয়ে খুবই ছোট হওয়ায় এবং জালের শেষ প্রান্তে ময়লা জমে ফাঁস একবারেই বন্ধ হয়ে যায়। এ প্রকার জালের আহরিত মৎস্য ও চিংড়ি প্রজাতির অধিকাংশই কিশোর ও অপ্রাপ্ত বয়সের। সামুদ্রিক মৎস্য ও চিংড়ি গভীর এলাকায় প্রজনন করলেও এরা কিশোর অবস্থায় স্বল্প লবনাক্ত উপকূলীয় এলাকায় চলে আসে এবং এখানে কিশোর জীবন অতিবাহিত করে পূনরায় গভীর সমুদ্রে চলে যায় এবং বড় হয়ে প্রজননে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু মোহনা বেহুন্দি জালে উপকূলীয় এলাকায় কিশোর বয়সে মৎস্য ও চিংড়ি প্রজাতিগুলো আহরিত হওয়ায় পরর্বী বংশরক্ষায় দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বে অব বেঙ্গল প্রকল্পের (BOBP) এক জরিপে মোহনা বেহুন্দিজাল (ESBN), চিংড়ি পোনা ধরা জাল এবং চরজাল (Beach Seine Net) ক্ষতিকর জাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং উল্লেখিত জালগুলো পর্যায়ক্রমে অপসারিত করে পরিবেশবান্ধব জাল (Eco Friendlz Gear) দ্বারা প্রতিস্থাপনের সুপারিশ করা হয়েছে।

৯.৩ বেহুন্দি জালের উপর জীবিকা অর্জনে নিয়োজিত মৎস্যজীবি ও তাদের সমস্যাঃ

উপকূলীয় এবং সমুদ্র এলাকায় প্রায় ৪৯,১৬৩ টি মোহনা ও সামুদ্রিক বেহুন্দি জালে মৎস্য ও চিংড়ি আহরিত হয়। বেহুন্দি জালে মৎস্য আহরণের জন্য প্রায় ২০,৭৫০ টি নৌকা ব্যবহৃত হয়। এদের মধ্যে সাধারণঃ উপকূলীয় এলাকায় দেশী নৌকা এবং সমুদ্র এলাকায় যান্ত্রিক নৌকা ব্যবহৃত হয়। উপকূলীয় এলাকায় ১২-২২ অশ্বক্ষমা সম্পন্ন ইঞ্জিন নৌকা মোহনা বেহুন্দি জালে এবং সমুদ্র এলাকায় ৪৫-৬৫ অশ্বক্ষমা সম্পন্ন ইঞ্জিন সামুদ্রিক বেহুন্দি জালে ব্যবহৃত হয় । উপকূলীয় এলাকায় প্রতি নৌকায় ৪-৫ জন জেলে এবং সমুদ্র এলাকায় ১৮-২০ জন জেলে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত থাকে। বেহুন্দি জালের সাথে সরাসরি মৎস্য আহরণে নিয়োজিত মৎস্যজীবির সংখ্যা প্রায় ১,০০,০০০ এবং পরোক্ষভাবে এর সাথে জড়িত রয়েছে প্রায় ৫,০০,০০০ লোক। প্রতিটি নৌকায় পূর্বে ব্যবহৃত হত ৫-৬ টি বেহুন্দি জাল, কিন্তু জাল প্রতি মৎস্য আহরণ হার (CPUE) দিন দিন হ্রাস পাওয়ায় র্বুমানে প্রতিটি নৌকায় ১৫-২০ টি জাল ব্যবহৃত হচ্ছে। আহরণ হার হ্রাস পাওয়ায় জেলেরা জালের ফাঁস ক্রমান্বয়ে ছোট করে সকল বয়সের ও আকারের মৎস্য ও চিংড়ি ধরে নেয়ার চেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছে।

৯.৪ বেহুন্দি জাল সম্পর্কিত সুপারিশঃ

বেহুন্দিজালে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত বিপুল সংখ্যক জেলে সম্প্রদায়ের অধিকাংশই দরিদ্র। তবে নিম্নেবর্ণিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করলে এর ক্ষতি অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব হবে।

১। উপক'লীয় এলাকা থেকে মোহনা বেহুন্দি জাল সরিয়ে দিয়ে সামুদ্রিক এলাকায় সামুদ্রিক বেহুন্দী জাল ব্যবস্থাপনা করা যেতে পারে;

২। যে সব এলাকায় যে ঋতুতে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মাছ ও চিংড়ি অধিক হারে ধরা পড়ে সে সব এলাকায় ঋতু চিহ্নিত করে মোহনা বেহুন্দি জালের ব্যবহার বন্ধ করে আহরণের মাত্রা কমানো যেতে পারে। এতে অপ্রাপ্ত বয়সের বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি রক্ষা পাবে;

৩।প্রশিক্ষণ ও সচেতনা বৃদ্ধি মুলক কার্যক্রমের (Awareness Building) মাধ্যমে জেলেদেরকে সচেতন করে মোহনা বেহুন্দি জালের বিকল্প হিসেবে তিন পরল্যা জাল, ফাঁস জাল, বড়শী ইণ্যাদি জাল ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা;

৪। সামুদ্রিক মৎস্য আইনে বেহুন্দি জালের জন্য শেষ প্রান্তের ফাঁস কমপক্ষে ৪৫ মিলিমিটার করার আইনটি বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করতে হবে, এবং

৫।সামুদ্রিক বেহুন্দি জালের জন্য ব্যবহৃত নৌযানগুলোকে দ্রুত রেজিষ্ট্রেশন ও লাইসেন্স এর আওতায় আনতে হবে।

সামুদ্রিক বেহুন্দী জাল বড় ফাসেঁর এবং বেশী গভীরতায় বসানো হয় বিধায় প্রাপ্তবয়স্ক অনেক মাছ আহরিত হওয়ার ফলে পরিবেশের জন্য এ জাল কম ক্ষতিকর। মোহনা বেহুন্দী জালের ফাঁস খুবই ছোট এবং কম গভীরতায় এ জাল ব্যবহার করার ফলে এ জালে মৎস্য সম্পদের ডিম, ধানিপোনা ও কিশোর পোনা যথেচ্ছভাবে আহরিত ও বিনষ্ট হয়। মশারির ঘন ফাসেঁর পেকুয়াজাল শীতকালে পানির স্রোত কম থাকায় মুলতঃ গুড়া চিংড়ি (এসিটিস) ধৃত হয়, কিন্তু এর সাথে অনেক বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন ডিম ও ধানী পোনাও ধরা পড়ে। সামুদ্রিক মৎস্য আইন ২০২০ এ সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের জন্য ক্ষতিকর বিধায় মোহনা বেহুন্দী ও পেকুয়া জাল দ্বারা মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে যার পূর্ণ বাস্তবায়ন করা আবশ্যক।

ব্লু ইকোনমি কর্ম পরিকল্পনায় সামুদ্রিক মৎস্য খাত

মিয়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত বিরোধ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে ২০১২ এবং ২০১৪ সালে শান্তিপূর্ণভাবে নিষ্পত্তির ফলশ্রুতিতে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশ তার মূল ভূখন্ডের ৮১ শতাংশ পরিমাণ রাষ্ট্রীয় জলসীমা অর্জন করে অর্থাৎ সমুদ্রে মোট ১,১৮,৮১৩ বর্গকিলোমিটার জলরাশির জলস্তম্ভ, সমুদ্রতল এবং অন্তমৃত্তিকায় বাংলাদেশের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অর্জন দেশের মেরিন ও উপকূলীয় অঞ্চলে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, সামুদ্রিক মৎস্য চাষ, পর্যটন, প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, বাণিজ্য (নৌপরিবহন) ও জ্বালানীকে (গ্যাস, তেল ইৎ্যাদি) ঘিরে কর্মসংস্থান ও প্রবৃদ্ধির নতুন অর্থনৈতিক সুযোগের অপার দ্বার উন্মোচন করেছে যা সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy) ধারণার অন্তর্ভুক্ত। সুনীল অর্থনীতি বলতে বাস্তুসংস্থানের ভারসাম্য ও জীববৈচিত্রের সুরক্ষা এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও শান্তি বজায় রেখে খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বাণিজ্য ও শিল্প বিকাশ সাধনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে সমুদ্রের অনুন্মোচিত (untapped) সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার ধারণাকে বুঝায়। এ প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশ সরকার ২০১৪ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করেছে এবং অংশীজনের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সুনীল অর্থনীতি ধারণা বিকাশ ও বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক নীতি ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই ধারবাহিকতায়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতি খাতের উন্নয়নকে বেগবান করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক, বাণিজ্যিক ও পরিবেশগণ প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ পূর্বক সুনির্দিষ্ট ০৯ টি খাত চিহ্নিত করে সে সব খাতের বিকাশ ও বাস্তবায়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে। যে ০৯টি খাতের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে সেগুলো হলঃ ১. সামুদ্রিক মৎস্য (Marine Fisheries) ব্যবস্থাপনা; ২. সামুদ্রিক মৎস্যচাষ (Mariculture) উন্নয়ন; ৩. বাণিজ্যিক নৌপরিবহন (Commercial Shipping) এর অবকাঠামোগণ উন্নয়ন; ৪. সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন (Marine Tourism) এর বিকাশ সাধন; ৫. অফশোর জ্বালানি ও সুনীল বায়োটেকনোলজি (Offshore Energy and Blue Biotechnologies) গবেষণা ও উন্নয়ন; ৬. স্থিতিশীল জীবিকার জন্য ম্যানগ্রোভের বাস্তুসংস্থানগণ সেবা (Ecosystem Services of Mangroves); ৭. জাহাজ নির্মাণ ও রিসাইক্লিং শিল্প (Ship Building and Recycling Industry) সম্প্রসারণ; ৮. সামুদ্রিক দূষণ (Marine Pollution) প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ; ৯. মেরিন স্পেশিয়াল প্ল্যানিং (Marine Spatial Planning) বাস্তবায়ন।

সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও সামুদ্রিক মৎস্যচাষ কে যথাক্রমে ১ ও ২ নম্বর গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে সুনীল অর্থনীতির কর্মপরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে। এথেকেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় বাংলাদেশের ভৌগলিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই খাতদ্বয়ের গুরুত্ব। বাংলাদেশের সামুদ্রিক অঞ্চল জীববৈচিত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ। উপকূলীয় অঞ্চলের বিশাল জনগোষ্ঠী সমুদ্রে মৎস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করতে পারলে সুনীল অর্থনীতির এই খাত আমাদের জন্য আশীর্বাদ স্বরুপ। তবে বিশাল জনগোষ্ঠীর চাহিদার পাশাপাশি সমুদ্রের উপর আমাদের নির্ভরতার কারণে এই খাত এর টেকসই ব্যবস্থানা নিশ্চিত করা যেমন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং কষ্টসাধ্যও বটে।

১০.১ সামুদ্রিক মৎস্য (Marine Fisheries Management) ব্যবস্থাপনার জন্য কর্মপরিকল্পনা

অগ্রাধিকার	উদ্যোগ	বিস্তারিত বিবরণ	সীমাবদ্ধতা	গৃহিতব্য পদক্ষেপ	দায়িত্বপ্রাপ্ত/ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	মেয়াদ	প্রাক্কলিত বাজেট	অন্যান্য সুপারিশ
১	যথাযথভাবে সামুদ্রিক মৎস্য মজুদ নির্ধারণে উদ্যোগ গ্রহণ ও সম্পন্নকরণ এবং ডিএনএ বারকোডিং (DNA Barcoding) এর মাধ্যমে প্রজাতিসমূহের সনাক্তকরণ।	জরিপের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে সামুদ্রিক মৎস্যমজুদ/মজুদ মূল্যায়ন/ নির্ণয় একান্ত প্রয়োজন। যথাযথ মেরিন মজুদ মূল্যায়ন/ নির্ণয়ের উদ্যোগ গ্রহণ ও সম্পন্নকরণের জন্য উন্নত ও আধুনিক জরিপ জাহাজ ভাড়া করা প্রয়োজন যাতে করে সমুদ্রে মৎস্য স্টক/মজুদ সম্পর্কিত বিস্তারিত অনুসন্ধান করা যেতে পারে।	ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপ সমূহের বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের অভাব বিদ্যমান।	মেরিন ফিশারিজ ব্যবস্থাপনা কার্যকর ভাবে উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যথাযথ কৌশল, পরিকল্পনা ও সমন্বয় সাধনের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান আগ্রহী বেসরকারী উদ্যোক্তাগণের সাথে আলোচনায় বসতে পারে। বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জরুরী ভিত্তিতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।	১.মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; ২. মৎস্য অধিদপ্তর; ৩. বিএফআরআই এর মেরিন স্টেশন; ৪. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; ৫. বিশ্ববিদ্যালয়	২০২০-২০৩০	৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায়)/ ৪২০.৪৯ কোটি টাকা (প্রায়)।	শিক্ষিত ও কারিগরী জনশক্তির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ইউরোপীয় দেশসমূহ, অস্ট্রেলিয়া এবং জাপানের সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উপরোক্ত দেশসমূহের সহিত প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করতে পারে।
২	প্রত্যেক প্রজাতির বার্ষিক সর্বোচ্চ আহরণসীমা (maximum allowable catch) নির্ধারণ	বার্ষিক সর্বোচ্চ আহরণসীমা নির্ধারণ বিভিন্ন মৎস্য প্রজাতির টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করবে।	সর্বমোট আহরণ সীমা বা মৎস্য আহরণের সুযোগের মাত্রা নির্ধারণ বিশেষতঃ বাণিজ্যিক মৎস্য স্টক আহরণের ক্ষেত্রে (টন বা সংখ্যায়) এখনও কার্যকরী উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় দেশী এবং বিদেশী গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে সক্ষমতা বাড়াতে পারে।	১.মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; ২. মৎস্য অধিদপ্তর; ৩. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।	২০২০-২০৩০	১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায়)/ ৮৪.০৯ কোটি টাকা (প্রায়)	কারিগরী জনশক্তির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নরওয়ে এবং জাপানের সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উপরোক্ত দেশসমূহের সহিত প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করতে পারে।

৩	সমুদ্রে ট্র্যাশ ফিশ (trash fish) নিক্ষেপ হ্রাসকরণ	বুঁমানে আর্টিস্যানাল এবং অননুমোদিত কাঠের নৌকা ব্যবহারকারী জেলেরা ফ্রিজিং স্পেসের (Freeying Space) অভাবের কারণে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতির সামুদ্রিক মাছের পোনা fish fry)/ juveniles মাছ সাগরে ছেড়ে না দিয়ে বোটের তলায় ও ঝুড়িতে ট্র্যাস ফিশ (trash fish) হিসেবে মজুদ করে। বিপুল পরিমানে ট্র্যাশ ফিশ আহরণ ও সাগরে নিক্ষেপ সমুদ্রের জীববৈচিত্র্য এবং ভবিষ্যত টেকসই সামুদ্রিক মৎস্য মজুদ ব্যবস্থাপনার জন্য মারাত্মক ঝুঁকি সৃষ্টি করে।	জেলেদের মধ্যে সচেতনুার অভাব রয়েছে। প্রশাসন যথেষ্ট তৎপর নয় এবং ট্র্যাশ ফিশ নিক্ষেপ হ্রাসকরণের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি এবং উপকরণের অভাব রয়েছে।	১. সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা কার্যকরভাবে উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যথাযথ কৌশল, পরিকল্পনা ও সমন্বয় সাধনের নিমিত্ত সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান আগ্রহী বেসরকারী উদ্যোক্তাগণের সাথে আলোচনায় বসতে পারে। ২. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিভাগ ট্র্যাশ ফিশ নিক্ষেপ হ্রাসকরণের জন্য নিয়ন্ত্রণ আরোপ এবং প্রয়োজনে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। ৩. অননুমোদিত আকারের জালের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা উচিত।	১.মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; ২. মৎস্য অধিদপ্তর; ৩. কোস্টগার্ড; ৪. এনজিওসমূহ	২০২০-২০৩০	মার্কিন ডলার ১-২ মিলিয়ন (প্রায়)/ ৮.৪০ থেকে ১৬.৮১ কোটি টাকা (প্রায়)	প্রাকৃতিক মজুদ বৃদ্ধির জন্য সামুদ্রিক মৎস্য জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধার প্রয়োজনীয়।
৪	ডিমওয়ালা মা বাগদা চিংড়ি ব্যবস্থাপনা	সুনির্দিষ্ট কর্মকৌশল প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডিমওয়ালা মা বাগদা চিংড়ি ব্যবস্থাপনা এবং মৎস্য আহরণ তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ চিংড়ি হ্যাচারীতে মানসম্মত পোনা উৎপাদন ও মজুদ পেতে সহায়তা করবে।	এখনও উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।	দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন।	১. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; ২. মৎস্য অধিদপ্তর; ৩. বিএফআরআই এর মেরিন স্টেশন; ৪. ইন্সটিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস এন্ড ফিশারিজ, চট্টগ্রাম; ৫. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।	২০২০-২০৩০	মার্কিন ডলার ০৫ মিলিয়ন (প্রায়)/ ৪২.০৪ কোটি টাকা (প্রায়)	সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাত যৌথভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি বাড়াতে সহায়তা করবে।

৫	নুন ফিশিং বিচরণক্ষেত্র / চারণভূমি অনুসন্ধান	কতিপয় মৎস্য স্টক/মজুদ হতে মাত্রাতিরিক্ত মৎস্য আহরণ সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি এড়াতে নুন ফিশিং বিচরণক্ষেত্র / চারণভূমি অনুসন্ধান, নুন মৎস্য স্টক/মজুদ সনাক্তকরণ এবং নুন মৎস্য ক্ষেত্র সমূহ বৈচিত্রপূর্ণ করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।	এখনও উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।	দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন।	১.মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; ২. মৎস্য অধিদপ্তর; ৩. বিএফআরআই এর মেরিন স্টেশন।	২০২০-২০৩০	মার্কিন ডলার ১০ মিলিয়ন (প্রায়)/ ৮৪.০৯ কোটি টাকা (প্রায়)	সংশ্লিষ্ট সরকারী মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।
৬	স্যাটেলাইটভিত্তিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সম্ভাব্য মৎস্য আহরণের অঞ্চল চিহ্নিত করা	সম্ভাব্য মৎস্য আহরণের অঞ্চল চিহ্নিত করার মাধ্যমে মৎস্যজীবীরা সরাসরি মৎস্যচারণ অঞ্চলে যেতে পারবে, যা তাদের যাতায়াত খরচ এবং সময় বাঁচাতে সাহায্য করবে।	স্পারসো কর্তৃক উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও সাফল্যের মুখ দেখা যায়নি।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্পারসো যৌথভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। অতিসুর উদ্যোগ গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে।	১. প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়/ স্পারসো; ২.মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; ৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।	২০২০-২০৩০	মার্কিন ডলার ০১ মিলিয়ন (প্রায়) /৮.৪০ কোটি টাকা (প্রায়)	মৎস্যজীবীদের জন্য সহজে ব্যবহারযোগ্য মোবাইল অ্যাপ তৈরি করা যেতে পারে।
৭	টুনা মাছ আহরণের লাইসেন্স প্রদান এবং ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণ	আকর্ষনীয় রপ্তানি মূল্যের টুনা মাছ আহরণ, বাংলাদেশের জন্য বিশাল সম্ভাবনার ক্ষেত্র। এটা প্রোটিনের ভাল উৎস হতে পারে, পাশাপাশি দেশীয় চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।	বাংলাদেশ সম্প্রতি IOTC এর সদস্য হওয়া সত্বেও টুনা মাছ আহরণে তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি। স্বল্প সংখ্যক লাইসেন্স প্রদান করা হলেও টুনা মাছ আহরণ উপযোগী জাহাজ তৈরি/সংগ্রহ করা হয়নি।	সক্ষমুা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শ্রীলঙ্কা, জাপানের সাথে বঙ্গোপসাগরে যৌথ মৎস্য আহরণ কর্মসূচি চালু করা যেতে পারে। বেসরকারি/ ব্যক্তিগণ উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান করতে হবে।	১. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; ২. মৎস্য অধিদপ্তর; ৩. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।	২০২০-২০২৫	মার্কিন ডলার ৫০ মিলিয়ন (প্রায়)/ ৪২০.৪৯ কোটি টাকা (প্রায়)	সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সহযোগিণা প্রয়োজন। টুনা মাছ আহরণ সমুদ্র অর্থনীতির বিকাশের নুন দিগন্ত। সম্ভাব্য অঞ্চল নির্ধারণ এবং বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক আকারের মাছের প্রাচুর্যতা নির্ণয়ের জন্য প্রাথমিকভাবে

								একটি স্টাডি/গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।
৮	ফিশ ল্যান্ডিং স্টেশন (Landing Station) এর আধুনিকায়ন এবং মোট মৎস্য আহরণের আধুনিক সেন্ট্রাল ডাটাবেস তৈরি	ফিশ ল্যান্ডিং স্টেশন আধুনিকায়ন এবং সুবিন্যস্ত ডাটাবেস মৎস্য সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে।	সর্বমোট মৎস্য আহরণের ডাটাবেস মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সুবিন্যস্ত উপায়ে উপাত্ত সংগ্রহ করার কোন পদ্ধতি এখনও চালু হয়নি। উপরন্তু, অল্প সংখ্যক মৎস্য আহরণের তথ্য ডাটাবেসে যুক্ত হয়না।	এমন একটি পদ্ধতি বের করা যেতে পারে যার ফলে সকল আহরিত মৎস্য নির্দিষ্ট ল্যান্ডিং স্টেশনে ল্যান্ড করতে পারে এবং আহরিত মৎস্যের তথ্য-উপাত্ত সেন্ট্রাল ডাটাবেসে অন্তর্ভুক্ত হয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সকল সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে পরামর্শ করে একটি কার্যক্ষম উপায় বের করতে পারে।	১. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; ২. তথ্য মন্ত্রণালয়; ৩ .বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; ৪. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।	২০২০-২০৩০	মার্কিন ডলার ২০মিলিয়ন (প্রায়)/ ১৬৮.১৯ কোটি টাকা (প্রায়)	সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সহযোগিণা প্রয়োজন। ন্যায্য বাজার দর নিশ্চিতকরণে ল্যান্ডিং স্টেশনে পর্যায়ক্রমে অনলাইন নিলামের ব্যবস্থা করতে হবে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, অস্ট্রেলিয়া, জাপানের কাছ থেকে সক্ষমা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ এবং পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১০.২ মেরিকালচার (Mariculture) উন্নয়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা

অগ্রাধিকার	উদ্যোগ	বিস্তারিত বিবরণ	সীমাবদ্ধতা	গৃহিতব্য পদক্ষেপ	দায়িত্বপ্রাপ্ত/ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা / মেয়াদ	প্রাক্কলিত বাজেট	অন্যান্য সুপারিশ
১	সী-ব্যাস মৎস্য প্রজনন (Seabass breeding) ও চাষ	কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন মেরিকালচার উন্নয়ন ঘটাবে।	কোন সী-ব্যাস মৎস্য হ্যাচারী ও নার্সারির অবকাঠামোগণ উন্নয়ন এখনও করা হয়নি।	অন্যান্য দেশসমূহ হতে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা গ্রহণ করা যেতে পারে।	১. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; ২. মৎস্য অধিদপ্তর; ৩. বিএফআরআই এর নোনা পানির স্টেশন এবং মেরিন স্টেশন।	২০২০-২০৩০	মার্কিন ডলার ৪.০ মিলিয়ন (প্রায়)/ ৩৩.৬৪ কোটি টাকা (প্রায়)	সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিণার মাধ্যমে সমুদ্রের উপকূল, নিকটবর্তী তীরভূমি ও অফশোর (Offshore) অঞ্চলে মেরিকালচার উন্নয়নে

								উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।
২	ইলিশ সাদ অফশোর খাঁচা (Hilsa shad offshore cage) কালচার/ইলিশ চাষ	খাঁচায় ইলিশ সাদ মৎস্য চাষ অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক পদক্ষেপ। বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন নদী প্রবাহ যেখানে ডিম পাড়ার সময় ইলিশ মাছের ঝাঁক বিচরণ করে থাকে সেখানে ইলিশ মাছ চাষ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।	১. প্রাকৃতিক দূর্যোগের প্রভাব। ২. এখনও উল্লেখযোগ্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।	১. সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাত যৌথ ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে। ২. অন্যান্য দেশসমূহ হতে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা গ্রহণ করা যেতে পারে। ৩. দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। ৪. বিএফআরআই, মৎস্য অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় একযোগে কাজ করতে পারে।	১. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; ২. মৎস্য অধিদপ্তর; ৩. বিএফআরআই এর নোনা পানির স্টেশন এবং মেরিন স্টেশন; ৪. ইন্সটিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস এন্ড ফিশারিজ, চট্টগ্রাম।	২০২০-২০৩০	মার্কিন ডলার ৫.০ মিলিয়ন (প্রায়)/ ৪২.০৪ কোটি টাকা (প্রায়)	ইলিশ মাছ চাষ বৃদ্ধি করা গেলে সারাবছর মাছের সরবরাহ বজায় থাকবে যা জনগণের প্রয়োজনীয় প্রোটিনের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়তা করবে।